চতুর্থ অধ্যায়

সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৈশোর কাল থেকে শুরু করে বার্ধক্য কাল পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন পর্বে নানাধরনের পত্রিকা পরিচালনা করেছেন। কখনও প্রত্যক্ষভাবে পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, আবার কখনও কখনও পত্রিকা সম্পাদনা না করলেও সম্পাদনার কাজে তিনি পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। কারণ পত্রিকা সম্পাদনা কাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল অপরিসীম কৌতূহল। তিনি মনে করতেন যে সাময়িকপত্রে প্রকাশ করার জন্য যেসব ব্যক্তিবর্গ তাঁদের লেখা সম্পাদকের দপ্তরে প্রেরণ করেন, সেইসব লেখাগুলো কাটছাঁট করে প্রকাশযোগ্য করে তোলেন সম্পাদক। আর এই সূত্রে সম্পাদক জানতে পারেন বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের চিন্তা-ভাবনার কথা। তাই পত্রিকা সম্পাদনার কাজ তিনি ত্যাগ করতে পারেননি। তিনি বলেছেন -- ''ব্যাধের বাঁশি শুনিয়া হরিণ যে কারণে ধরা দেয়, আমারও সেই একই কারণ। অর্থাৎ তাহা কৌতূহল, আর কিছুই নহে।

দেশের যে সকল লোক নানাবিষয়ে নানারকম ভাবনাচিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি ভাবিতেছেন জানিবার যদি সুযোগ পাওয়া যায়, তবে মনে ঔৎসুক্য না জন্মিয়া থাকিতে পারে না।...''[১]

সম্পাদনা কাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও কৌতূহল দুইই সমানভাবে ছিল। কিন্তু তিনি নিজে যেমন দীর্ঘদিন ধরে 'অনন্যকর্ম্মা' হয়ে কোনো পত্রিকা সম্পাদনা কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেননি, তেমনি তাঁর ধারণা অধিকাংশ সম্পাদকের পক্ষেও প্রায়শই তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এইজন্য সাময়িকপত্রের সম্পাদকের চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ করুণার পাত্র রূপে এঁকেছেন এবং সম্পাদকের উদ্দেশ্যে তির্যক পরিহাস ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন -- ''সম্পাদক যদি অনন্যকর্ম্মা হইয়া কর্ণধারের মতো পত্রিকার চূড়ার উপর সর্ব্বদাই হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন তবেই তাঁহার যথাসাধ্য মনের মত কাগজ চালানো সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেশের সম্পাদকের পত্র-সম্পাদন হালগোরুর দুধ দেওয়ার মত, -- সমস্ত দিন খেতের কাজে খাটিয়া কৃশ প্রাণের রসাবশেষটুকুতে প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইয়া যোগান্ দিতে

হয়; তাহাতে পরমধৈর্য্যবান্ জন্তুটারও প্রাণান্ত হইতে থাকে, ভোক্তাও তাহার বার্ষিক তিনটাকা হিসাবে ফাঁকি পড়িল বলিয়া রাগ করিয়া উঠেন।''[২]

আমাদের আলোচ্য বিষয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা হলেও, আমরা প্রথমে ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত পত্রিকা এবং অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ কতটা ছিল -- তা আলোচনা করে নেব।

১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহ ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। তাঁরই পরিকল্পনায় 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যদিও সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তবু প্রথম বছরে 'ভারতী'র পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বঙ্গদর্শনের মতোই একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করতে। কিন্তু ধর্মপ্রাণ ও দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকেই বলিষ্ঠ আকারে গড়ে তুলতে। তবে তত্ত্ববোধিনী ধর্মীয় পত্রিকা, তাই তাঁরা অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুজেরা ধর্মের চেয়ে সাহিত্যের জন্যই আগ্রহ দেখালেন বলে নতুন পত্রিকারূপে 'ভারতী' আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী' পত্রিকাটি প্রকাশকালে তার নাম দিয়েছিলেন 'সুপ্রভাত'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মনে করেন ঐ নামের মধ্যে একটা স্পর্ধিত ভাব আছে। যেন বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রভাত তাঁরাই প্রথম করলেন। সুতরাং পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নাম রাখলেন 'ভারতী'। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী শরৎকুমারী চৌধুরানী 'ভারতী' প্রতিষ্ঠাকালের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'ভারতী'র ভিত্তিস্থাপনকারীদের অন্যতম। তিনি বলেছেন - ''সে সময় প্রতি রবিবারে জ্যোতিবাবু ও রবীন্দ্রনাথ ভারতীর ভান্ডার লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া 'ভারতী' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও পরে 'তাঁহাকে' লইয়া বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে যাইতেন এবং সেখান হইতে জোড়াসাঁকো ফিরিয়া যাইতেন।''[৩] জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন --''বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। এই আর-একটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিষয় হইল।

আমার বয়স তখন ঠিক ষোলো। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না।''[৪] 'ভারতী' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। বঙ্গদর্শন পত্রিকার পাশে 'ভারতী' পত্রিকা একটি সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথের লেখা ছোটোগল্প 'ভিখারিনী' এবং একটি বড় গল্প 'করুণা' 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এবং 'কবিকাহিনী' কাব্য 'ভারতী' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। তাছাড়া বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয় যা পরবর্তীকালে 'শৈশব সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'ভারতী' পত্রিকা একাদিক্রমে যাঁরা পরিচালনা করেন, তাঁরা হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী ও হিরন্ময়ী দেবী। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে (১৮৯৭-৯৮ সাল) রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। তিনি একবছর 'ভারতী'র সম্পাদক ছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই রাজনৈতিক প্রবন্ধ। 'ভারতী' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধ লিখে তিনি এইদিকে শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা 'বালক' প্রকাশিত হয়। ঠাকুর বাড়ীর ছেলেদের জন্যই এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। একবছর চলার পর 'বালক' পত্রিকাটি 'ভারতী'র সঙ্গে মিলিত হয়ে যায় এবং পত্রিকার নাম হয় 'ভারতী ও বালক'। রবীন্দ্রনাথই 'বালক' পত্রিকার অন্যান্য লেখকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। 'বালক'-এর পৃষ্ঠাতেই রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' নাটক এবং 'রাজর্ষি' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন বটে কিন্তু রবীন্দ্রনাথই আসলে পত্রিকার সব কাজ পরিচালনা করতেন।

১২৯৮ বঙ্গাব্দে (১৮৯১ সাল) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'হিতবাদী' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক। কিন্তু এই পত্রিকার সাহিত্য বিভাগ রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন সম্পাদনা করেন। 'হিতবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি ছোটোগল্প 'দেনাপাওনা', 'গিন্নী', 'পোস্টমাস্টার' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। এককথায় বলা যায় 'হিতবাদী'তেই রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প লেখার যথার্থ সূত্রপাত।

'হিতবাদী' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১২৯৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে, আর ঐ বছরেই অর্থাৎ ১২৯৮ বঙ্গাব্দের (১৮৯১ সাল) অগ্রহায়ণ মাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা 'সাধনা'। সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তিনি তিন বছর পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। তারপর এই 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদনার ভার পড়ে রবীন্দ্রনাথের উপরে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকাকে বিভিন্ন ধরনের রচনা প্রকাশের দ্বারা সমৃদ্ধ করেন। তাঁর রচিত ছোটোগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ 'সাধনা'য় প্রকাশিত হতে থাকে। পরে যখন 'সাধনা' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায় তখন তাঁর গল্প রচনার উৎসাহও স্তিমিত হয়ে আসে। 'সাধনা'র যুগে রবীন্দ্র প্রতিভা বিভিন্নদিকে বিস্তৃত হয়েছিল। অজিত চক্রবর্তী বলেছেন যে সেটা যথার্থভাবেই রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনে একটা সাধনার কাল ছিল।

'বঙ্গদর্শন'-এর যুগে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 'বঙ্গদর্শন' ১২৭৯ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। চার বছর পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র, তারপর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে আরো দুজন সম্পাদক পত্রিকাটি কিছুকাল সম্পাদনা করেন। কিছুদিন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ থাকার পর পুনরায় রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয় ১৩০৮ বঙ্গাব্দে। রবীন্দ্রনাথ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩১২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'ভারতবর্ষ', 'আত্মশক্তি' গ্রন্থে আমরা যেসব প্রবন্ধ পাই সেই প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাতেই লিখেছিলেন। আত্মশক্তি প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে জাতীয়তাবোধের ভাবনাকে জাগিয়ে দিয়েছেন। ভারতবর্ষ সমাজাশ্রয়ী দেশ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশ চিন্তাকে সারা দেশে ব্যাপ্ত করে দিতে চাইলেন এবং ভারতবর্ষীয় সমাজকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠবার আহ্বান জানালেন। এই যুগের বিশিষ্ট প্রেরণা থেকে জন্ম নিল 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি। 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থের কবিতা ও 'চোখের বালি' উপন্যাস 'বঙ্গদর্শনে'ই প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে সকল সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন তার মধ্যে অন্যতম সাময়িকপত্র 'ভান্ডার'। এই পত্রিকাটির সঙ্গে রবীন্দ্র সাহিত্য অনুরাগী পাঠকের খুব বেশী পরিচয় নেই। 'ভান্ডার' ছিল স্বদেশ ভাবনামূলক পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে 'বঙ্গদর্শন' এবং 'ভান্ডার' পত্রিকা সম্পাদনা করেন ১৩১২ বঙ্গাব্দে। অতঃপর ১৩১২ বঙ্গাব্দের শেষে 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক পদ ছেড়ে দেন। এবার শুধু 'ভান্ডার' নিয়েই থাকেন। 'ভান্ডার' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনার মধ্যে থাকতো স্বদেশ সম্পর্কে আলোচনা, তাছাড়া থাকত রাজনৈতিক প্রবন্ধ, মতামত বা মন্তব্য এবং কিছু দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা। এছাড়া কোনো রকম গল্প বা লঘু রচনা প্রকাশ করা হ'ত না। 'ভান্ডার' পত্রিকাটি আকারে খুব বড় ছিল না। 'ভান্ডার' পত্রিকাতেই 'সঞ্চয়' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল, তাতে অন্যান্য পত্রিকা থেকে বিভিন্ন রচনার সংকলন থাকত। 'ভান্ডার' পত্রিকাটিতে রবীন্দ্রনাথের বাউল সুরের অনেকগুলি গান প্রকাশিত হয়েছিল। সারি বাউল এবং কীর্তনের সুরের মধ্য দিয়ে সহজে দেশের মানুষের মনকে স্পর্শ করতে পারবেন বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন। তাই ঐ সব গানের সুরগুলিকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ১৩১২ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩১৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত 'ভান্ডার' পত্রিকা পরিচালনা করেন। 'ভান্ডার'-এর প্রকাশক ছিলেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত। পত্রিকাটি আকারে ছোট হলেও এই পত্রিকায় স্বদেশী আন্দোলন, সংগঠন, শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্পাদকের স্বরচিত প্রবন্ধ যেমন থাকত, তেমনি অন্যান্য লেখকদের প্রবন্ধও থাকত। 'বঙ্গদর্শন'-এর সময় রবীন্দ্র মানসিকতার যে পরিবর্তনের সূচনা হয় 'ভান্ডার'-এর পর 'তত্ত্ববোধিনী'তে এসে তা পূর্ণতা পায়। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদনকালে রবীন্দ্রনাথের যে পরিবর্তিত মানসিকতার পরিচয় পাই, তারই প্রতিফলন ঘটেছে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের কবিতা গুলির মধ্যে।

ইতিপূর্বে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কোনো কোনোটাতে ধর্মীয় আভাস পাওয়া যায়। মাঝখানে 'ভান্ডার' পত্রিকা সম্পাদনার সময় রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ কিছুসময়ের জন্য স্বদেশাভিমুখী হলেও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হয়ে তিনি পুনরায় ধর্মচিন্তায় মগ্ন হলেন। 'ভান্ডার' ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত

পত্রিকা। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছিল ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র, প্রথমদিকে ধর্মালোচনাই ছিল এর মুখ্য বিষয়। পরবর্তীকালে সাহিত্য, শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা এর বিষয়ীভূত হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই সংকীর্ণ অর্থে ধর্মকে দেখেননি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্ম সংক্রান্ত বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সময় তৃতীয়বারের জন্য বিলাতযাত্রা করেন। এই বিলাতযাত্রা উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করেন, পরবর্তীকালে 'পথের সঞ্চয়' নামক গ্রন্থে ঐ প্রবন্ধগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে মানসিকতার পরিচয় পাই তাতে দেখি যে তিনি এক উদার মানবলোকে যাত্রা করেছেন। ইউরোপ যাত্রা তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে তীর্থযাত্রা বলে মনে হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের সীমা অতিক্রম করে এবার বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্রে নিজের জায়গা করে নিলেন।

১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় কবিতা, প্রবন্ধ ও ছোটোগল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মুক্ত মনন এবং কাব্যের নতুন ধারা সূচিত হয়। তার পূর্বে তত্ত্ববোধিনী পর্বে এসে রবীন্দ্রজীবনের একটি পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। কারণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল কতকগুলি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। তা'হল --

প্রথমত ঃ- সেই সময়ের নব্যশিক্ষিত তরুণদের অন্ধ হিন্দুধর্ম বিদ্বেষকে সুপথে চালিত করা।

দ্বিতীয়ত ঃ- বিদেশী খ্রিস্টান মিশনারীদের হিন্দুধর্ম বিরোধী নিন্দাবাদের জবাব দেওয়া।

তৃতীয়ত ঃ- নবীনদের মধ্যে ধর্মান্তরকরণের অভিযানের প্রতিরোধ করা।

চতুর্থত ঃ- বেদান্ত উপনিষদের অন্তর্নিহিত সত্য প্রচার করে অসত্যের অপপ্রচারকে বন্ধ করা।

তাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৮৩২ শকাব্দ (১৯১০ সাল) পর্যন্ত পত্রিকার বিষয়ীভূত ছিল - উপদেশ, প্রার্থনা, তপস্যা সম্বন্ধে নানা কথা। তাছাড়া পত্রিকার মলাটের প্রথম পৃষ্ঠায় আর শেষ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন স্বরলিপি গ্রন্থের বিজ্ঞাপন থাকত। ১৮৩৩ শকাব্দ (১৯১১ সাল) বৈশাখ মাস থেকে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হন

এবং সহকারী সম্পাদক হন চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করার পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার মধ্যে যেমন বিষয় বৈচিত্র্য দেখা যায় তেমনি আঙ্গিকগত দিক থেকেও পরিবর্তন সাধিত হয়। এই বছরের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সূচিপত্রে লেখকদের রচিত বিষয়ের উল্লেখের সঙ্গে লেখকদের নামের তালিকা রয়েছে। কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিটি রচনার শেষে লেখকদের নাম নেই। তবে জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনীর প্রতিটি সংখ্যায় সূচিপত্রে যেমন প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখের সঙ্গে তাদের লেখকদের নামের তালিকা রয়েছে তেমনি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিটি রচনার শেষে লেখক গোষ্ঠীর নিজেদের নাম রয়েছে। এই আঙ্গিকগত পরিবর্তন ছাড়াও বিষয়গত দিক থেকেও পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। তত্ত্ববোধিনী ধর্মীয় পত্রিকা। ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা, ধর্মের সার কথা প্রচারই এর অন্যতম উদ্দেশ্য। পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করে প্রথম সংখ্যায় (১৮৩৩ শকাব্দ বৈশাখ) রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্থকতা' প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। তবে এই প্রথম সংখ্যায় ধর্মীয় প্রবন্ধ নিবন্ধ ছাড়াও 'যন্ত্র ও জীব' শিরোনামে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই বছর থেকেই পত্রিকার প্রতি সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় 'আশ্রম সংবাদ' ও গ্রন্থ সমালোচনা স্থান পায়। তবে রবীন্দ্রনাথ একাদিক্রমে চার বছর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেন, এবং এই চার বছর পত্রিকার প্রতি সংখ্যাতেই এক বা একাধিক স্বকীয় রচনা সম্পাদকের তরফে প্রকাশিত হ'ত -- যার মধ্যে ভাষণ, উপদেশ, বক্তৃতা জাতীয় রচনা যেমন ছিল, তেমনি অন্যান্য বিষয়ের রচনাও থাকত। যেমন 'খেলা ও কাজ', 'সমুদ্রপাড়ি', 'বোম্বাইশহর' প্রভৃতি মনন সমৃদ্ধ প্রবন্ধ। আবার বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রচিত 'মা মা হিংসীঃ', 'পাপের মার্জ্জনা' প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৩৩ শকাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'বেদান্ত পাঠ', 'গীতা পাঠ' প্রভৃতি ধর্মীয় প্রসঙ্গ ছাড়াও 'কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত', 'বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা' - শ্রীনগেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের রচিত প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হয়। অতএব একথা বলা যায় যে ১৮৩৩ শকাব্দ থেকে তত্ত্ববোধিনী শুধু ধর্মীয় বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে নি। ইতিহাস, কৃষি, বিজ্ঞান, সাহিত্য সমালোচনাও এতে স্থান পেয়েছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার বৈশিষ্ট্য ঃ-

বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। যিনি প্রতিমুহূর্তে কাব্য-কবিতায়, গদ্য-গল্প-সঙ্গীত-নাটক রচনায় কোটালের বান ডাকিয়েছেন, প্রতিক্ষণে নব নব সৃষ্টির উন্মাদনায় পাঠককুলকে বিস্মিত, চমকিত করেছেন - এহেন কবি রবীন্দ্রনাথের এই বহুমুখী রচনার ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক স্বতন্ত্র ধারার পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। যদিও কবি রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম কবিতা 'অভিলাষ' তত্ত্ববোধিনীতেই প্রকাশিত হয়েছিল 'দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচনা' শিরোনামে। তারপর চোদ্দ বছর বয়সে আরেকটি কবিতা 'প্রকৃতির খেদ' প্রকাশিত হয়। বাইশ বছর বয়সে 'স্রোত' এবং পঁচিশ বছর বয়সে 'সত্য' নামাঙ্কিত কবিতাটি প্রকাশের পর একেবারে দীর্ঘ বিরতি। পরবর্তী কবিতা 'প্রতীক্ষা', 'পরাস্ত', 'ছুটি', 'শেষকথা' ও 'আনন্দরূপ' প্রকাশিত হয়েছে যখন কবির বয়স একান্ন বছর। কারণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনার খাতিরে প্রতিনিয়ত পত্রিকার কলেবর ভরে দেওয়ার তাগিদ অনুভব করেছেন, তখন সেই তাগিদে এই সব কবিতা প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্র কবি প্রতিভার বিচিত্রমুখী আত্মপ্রকাশের পরিচয় পাওয়া যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায়। তবে গল্পকার রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি কিংবা ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথেরও আত্মপ্রকাশ ঘটেনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায়। কারণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছিল একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র, এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সর্বদা সতর্ক থাকতেন। তাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আমরা লেখক রবীন্দ্রনাথের এক স্বতন্ত্র মানসিকতার, এক ধার্মিক ঋষি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাই।

''রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাবান সুলেখক, রবীন্দ্রনাথ চিন্তাশীল দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ সুপন্ডিত, রবীন্দ্রনাথ আদর্শ নৈষ্ঠিক গৃহস্থ, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঋষি।''[৫] এই পরিচয়ের বীজ উপ্ত হয়েছিল একেবারে বাল্য বয়সে। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধ্যানমন্দ্রিত গম্ভীর ব্যক্তিত্ব কবিকে প্রভাবিত করেছিল নিশ্চয়ই। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বালক বয়সে একদিকে যেমন ঔপনিষদিক ভক্ত মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথকে পেয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে পেয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো সাহিত্য, সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে। উপরন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তীর মতো লেখক। এই উভয়ের প্রভাবই বালক রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা ও ধর্মানুভূতিকে পুষ্ট করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সাধক বলেননি কখনো। 'আত্মপরিচয়'-এ তিনি বলেছেন - ''একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে সে আর কিছুই নয় আমি কবি মাত্র।'' তিনি যেমন সাধক নন, তেমনি মুক্তির সন্ধানও তিনি করেননি। বরং তিনি বলেছেন ''বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।'' তবে ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ কোনো বাহ্যিক বিষয় মাত্র নয়, তাঁর হৃদয়াবেগের গভীর উপলব্ধি ও অনুভূতি থেকে জাত। সাহিত্যের নানা শাখায় রবীন্দ্র প্রতিভার স্ফূরণ যেমন ঘটেছে, তেমনি তাঁর নিজের সৃষ্টির জগৎ ছাড়াও নানা বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিন্তা-ভাবনা করেছেন। এই বিষয়গুলির মধ্যে সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা নিয়ে যেমন ভেবেছেন, তেমনি ভেবেছেন ধর্ম নিয়ে। তিনি তাঁর প্রবন্ধ, ভাষণ ও উপদেশের মধ্য দিয়ে যেমন নিজের চিন্তা-ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন, তেমনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর গভীরতর নিবিড়তর উপলব্ধির কথা। রবীন্দ্র জীবন-ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হ'য়ে রয়েছে তাঁর ধর্মচিন্তা। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার সঙ্গে তাঁর উপলব্ধি মিশে রয়েছে। তাঁর সমাজ সম্পর্কিত ভাবনা, তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় সৃজনশীল সাহিত্যচিন্তার মধ্যে। আর এই প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে তাঁর ধর্মচিন্তাও যে কতখানি সৃজনশীল ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে, তাঁর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর যে ঔপনিষদিক পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বড় হয়েছেন, তার প্রভাব রয়েছে তাঁর ধর্ম চিন্তার মধ্যে। এছাড়া রয়েছে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত ধর্মচিন্তা ও ধর্ম সাধনার প্রভাব। ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে -- তাঁদের তিনজনের উপনয়ন হবার পর নিয়মিতভাবে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হ'ত। সেই প্রসঙ্গে বলেছেন -- ''আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূ র্ভূ বঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কী ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয়

যে কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্কটা বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া।''[৬] এ প্রসঙ্গেই অন্যত্র বলেছেন --''শানবাঁধানো মেঝের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্রই বুঝিতে পারিলাম না। ... অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।''[৭] জগৎ ও জীবনের সকল বস্তুই রবীন্দ্রনাথ নিজের অন্তরের অনুভূতি দিয়ে উপভোগ করেছেন। ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁর নিজের যে অনুভূতি প্রকাশিত তাকেই সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলেছেন।

উনিশ শতকে যে নবজাগরণ ঘটেছিল, তা শুধু সাহিত্য আর শিল্পের দিক থেকেই ঘটেনি, ধর্মের দিক থেকেও নবজাগরণ ঘটেছিল। শহর কোলকাতায় কত রকমের ধর্মের প্রচার যে ঘটেছিল আর ধর্ম নিয়ে তর্কবিতর্ক চলেছে তা সমসাময়িক ইতিহাস পড়লেই বোঝা যায়। রামমোহন দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা-ভাবনা করে এমন এক আদর্শ ধর্মের প্রচলন করতে চেয়েছেন যার মূলকথা -- সর্বধর্মের সারকথা, সকল সম্প্রদায়ের মানুষই যেখানে এসে মিলিত হবে। তাই তিনি অন্ধলোকাচারের বিরোধিতা করেছেন। ধর্মের সংকীর্ণতাকে আঘাত করে এমন এক ধর্মের প্রচলন করতে চেয়েছেন, যে ধর্মের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা নেই, যে ধর্মের মধ্যে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ অবাধে মিলিত হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৮২৮ সালে রামমোহন ব্রাহ্মধর্মের প্রচলন করেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -- ''ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত দিক্ থেকে আমাদের একটি আশ্রয় দিয়েছে সেটা অবহেলা করবার নয়। পূর্ব্বে আমাদের ভক্তিবৃত্তি জ্ঞানবৃত্তি বহুদিনব্যাপী দুর্গতিপ্রাপ্ত দেশের নানা খন্ডতা ও বিকৃতির মধ্যে যথার্থ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারছিল না। পৃথিবী যখন তার বৃহৎ ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের দেশবদ্ধ সংস্কারের বেড়া ভেঙে আমাদের সম্মুখে এসে আবির্ভূত হল, তখন হঠাৎ বিশ্বপৃথিবীব্যাপী আদর্শের সঙ্গে আমাদের বিশ্বাস ও আচারকে মিলিয়ে দেখবার একটা সময় এসে পড়ল। সেই সংকটের সময় অনেকেই নিজের দেশের প্রতি এবং প্রচলিত

ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছিল। সেই বিপদের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বুদ্ধিকে ও ভক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে, আমাদের ভেসে যেতে দেয়নি।''[৮]

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন যে, ভারতবর্ষ বারবার নানান বহির্দেশের নানান ধর্মের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষ তার অন্তরের সত্যকে উদঘাটিত করে বাইরের আঘাতকে সহজে গ্রহণ করতে পেরেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হ'ল যে - সত্যই কেবলমাত্র সত্যের আঘাত গ্রহণ করতে পারে। তাই আঘাত এলে প্রত্যেক জাতি হয় নিজের শ্রেষ্ঠ সত্যকে সমুজ্জ্বল করে প্রকাশ করে, তা নাহলে নিজের মিথ্যের দ্বারা সকলকে উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে যায়। ভারতবর্ষেরও যখন আত্মরক্ষার দিন এসেছিল, তখন একের পর এক সাধক এসে ভারতের চিরসত্যকে প্রকাশ করে তুলে ধরেছিলেন। তারপর আবার পাশ্চাত্য জগতের সত্য যখন ভারতবর্ষের দুর্গদ্বারে আঘাত করে তখনও নব আগন্তুকের সাড়া পেয়ে ভারতবর্ষের নবীন সাধকেরা নির্ভয়ে তার বহু দিনের অবরুদ্ধ দুর্গপ্রাচীরের দ্বার খুলে দিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -- ''ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন সাধনার দ্বার-উদ্‌ঘাটনই ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক তাৎপর্য।''[৯] ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা এখানে যে ভারতবর্ষের সাধনাক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবীর সত্য সাধনাকেই গ্রহণ করবার মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেছে। অন্য অনেক আবর্জনার মধ্যে ব্রহ্মসাধনা একদিন আমাদের দেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। ঠিক এইরকম সময়েই রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন।

'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' ভাষণের সঙ্গে 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধটির মিল রয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের মহত্ত্বের কথাই ঘোষণা করেছেন। আবার 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধে দেখা যায় রামমোহনের প্রতি দেশবাসীর যে ঔদাসীন্য রয়েছে তার প্রতি অনুযোগক্ষুব্ধ প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সকল শক্তি নিয়োগ করেছেন। রামমোহন ছিলেন উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। তাঁর ঔপনিষদিক ব্রহ্মানুরাগ বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। কিন্তু বহুতর

জনগোষ্ঠী থেকে দূরে থাকার জন্য রামমোহনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। রামমোহন দেখেছেন যে তাঁর সমসাময়িককালে লৌকিক হিন্দুধর্ম কুসংস্কারের পঙ্কে নিমজ্জিত। তিনি ধর্মের মধ্যে প্রশংসা করার মত কিছু খুঁজে পাননি। তাই ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন বা 'আত্মীয়সভা' স্থাপনের বিষয়ে হিন্দুসমাজের সাধারণ জনগণের কথা ভাবেননি। এমনকি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও তিনি আহ্বান করেননি। হিন্দুধর্মের যে মূল প্রবাহ তা থেকে রামমোহন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন এবং একটি ক্ষুদ্র শাখাপথে নিজের ধর্মসাধনা এবং তত্ত্বব্যাখ্যা পরিচালিত করেছেন।

ব্রহ্মের উপাসনার ব্যাপক প্রবর্তনের জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন অপরিহার্য ছিল। তাই 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্যবাণী ঘোষণা করেছে। ঐ প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ''যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্ব্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠ্‌তে পারে। সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্ত্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস।''[১০]

রামমোহন বিভিন্ন উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে এমন একটি ধর্মের প্রচলন করেন, যার মধ্যে রয়েছে সকল ধর্ম সমন্বয়ের মনোভাব। সবরকমের সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন মুছে দিয়ে সকলধর্মের মিলনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে রামমোহনের সর্বধর্ম সমন্বয়ের মনোভাব। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার আরম্ভ হয়েছে বাল্য বয়সে ঔপনিষদিক পরিবেশে অবাধ বিচরণের মধ্যে দিয়ে। পরবর্তীকালে নানা উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তাকে পুষ্ট করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন নিজের মনের মতো করে উপনিষদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন, তেমনি উপনিষদ ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত, বুদ্ধদেবের জীবন ও সাধনা, বৈষ্ণবের প্রেমভক্তি, সুফী সাধনা প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায় থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলিকে নিজের মতো করে গ্রহণ করেছেন এবং এসবের দ্বারাও নিজের ধর্ম চিন্তাকে আরো পরিপুষ্ট করেছেন।

'ধর্ম্মের অর্থ কি' -- এই জিজ্ঞাসাই তত্ত্ববোধিনী পর্বে রবীন্দ্রনাথের মনকে বরাবর উদ্বেল করে তুলেছে। 'ধর্ম্মের অর্থ' প্রবন্ধে তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে ... বীরের ধর্ম বীরত্ব, রাজার ধর্ম রাজত্ব -- মানুষের ধর্ম ধর্মই-তাকে আর কোনো নাম দেবার দরকার করে না। তাঁর মতে মানুষের উপর একটা মস্ত সমস্যার মীমাংসা-ভার পড়েছে। আলো ও অন্ধকারের মতোই বড় ও ছোটো মানুষের জীবনে তার চিন্তায় অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। ''... এই দুইয়ের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টাই তাহার সকল চেষ্টার মূল। এই সামঞ্জস্য যদি না করিতে পারা যায় তবে ছোটরও কোন অর্থ থাকে না, বড়টিও নিরর্থক হইয়া পড়ে।''[১১] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আমাদের ক্ষুদ্র মন - যা আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত, একটি বৃহৎ সমালোচকের সঙ্গে ভালোরকম করে মিলতে চায়। যে পরিমাণে মিল ঘটে সেই পরিমাণেই তার সার্থকতা বা পূর্ণতা। আর এই মিলনের জন্যই মানুষ তার নিজের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করে অর্থাৎ নিজের পরিবার সমাজ ও দেশ ছেড়ে বিশ্বমানব সমাজের মধ্যে নিজেকে বিস্তারিত করে দিতে চায়, এটাই মানবের একমাত্র সাধনা। মানুষ তার বহু কাঙ্খিত বিষয়ের বন্ধন থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু মুক্তি আর বন্ধন এমনভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে যে তাদের আলাদা করা যায় না। ''ব্যাপ্তি এবং সমাপ্তি এই যে দুটি তত্ত্ব সর্ব্বত্র একসঙ্গেই বিরাজ করিতেছে আমাদের মধ্যেও নিশ্চয় ইহার পরিচয় আছে। আমরাও নিশ্চয় আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য অনন্ত জীবনের প্রান্তে পৌঁছিবার দুরাশায় অপেক্ষা করিতেছি না। একথা বলিতেছি না যে, এখনো যখন আমার সমস্ত নিঃশেষে চুকিয়া বুকিয়া যায় নাই তখন আমি আপনাকে জানিতেছি না। বস্তুত আমার মধ্যে একদিকে চলা, এবং আর একদিকে পৌঁছানো, একদিকে বহু, আর একদিকে এক, একসঙ্গেই রহিয়াছে, নহিলে অস্তিত্বের মত বিভীষিকা আর কিছুই থাকিত না। একদিকে আমার বিচিত্র শক্তি বাহিরের বিচিত্রের দিকে চলিয়াছে, আর একদিকে আমার আনন্দ ভিতরের একের দিকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।''[১২] ধর্ম সম্বন্ধে এতকাল ধরে যে ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল, ধর্মের অর্থ প্রবন্ধে ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা তা থেকে একেবারে আলাদা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় (১৮৩৩ শকাব্দ ফাল্গুন, ১৯১২ সাল) 'ধর্ম্মের নবযুগ' প্রকাশিত হয়।

'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ যা ধারণ করে, যা মানুষকে আশ্রয় দেয়। Religion অর্থ কিন্তু এরূপ নয়। Religion এর মধ্যে আচরণীয় ক্রিয়াকলাপ রয়েছে যা 'ধর্ম্ম' শব্দে নেই। 'ধর্ম্ম' হচ্ছে সনাতন, শাশ্বত এবং অপৌরুষেয়।

ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষে আসে, এবং এখানে আসার পর তাদের শাসনকার্য সুদৃঢ় করবার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার প্রসার ঘটায়, তখন পাশ্চাত্যের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান এবং রাজনীতির দ্বারা ভারতবাসীরা প্রভাবিত হয়। শুধু তাই নয় পাশ্চাত্যের দর্শন ধর্মতত্ত্বও ভারতীয়দের মনকে প্রভাবিত করে তাদের পুরাতন আশ্রয় থেকে টেনে বের করে এনেছিল। শুরু হয়েছিল নতুন প্রজন্মের সঙ্গে পুরাতনের দ্বন্দ্ব। পুরাতন সবকিছুর প্রতিই নবীনদের মনে অনাস্থা দেখা দেয়। ফলে ধর্মের বাহ্যিক আচার বড় হয়ে ওঠে। আর এই আচারসর্বস্ব ধর্মের পাদপীঠতলেই ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের স্থান। পরে ধীরে ধীরে আচারের বাঁধন ছিঁড়ে যুক্তিবাদ প্রাধান্য লাভ করে। 'ধর্ম্মের নবযুগ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন ''কিছুকাল হইতে মানুষের সভ্যতার মধ্যে একটা খুব বড় রকমের পরিবর্ত্তন দেখা দিতেছে -- তাহার মধ্যে সমুদ্র হইতে যেন একটা জোয়ার আসিয়াছে।''[১৩] দর্শন, বিজ্ঞান ক্রমে ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হ'ল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত রচনায় প্রচার করেছেন যে মানবজীবনের সঙ্গে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মের কোনো বিরোধ নয়, বরং সামঞ্জস্যই রয়েছে। 'নবযুগের ধর্ম্ম' মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য ঘুচানোর বাণী বহন করছে। মানুষ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীব অন্য জীবের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই এই অজ্ঞানতার বেড়া ভেঙে গেছে। জড়ের সঙ্গে জীবের যে একটা যোগ রয়েছে তা প্রমাণিত হয়েছে। চিন্তাবিদেরা তাই মানুষের ঐক্য গড়ে তুলতে চাইছেন। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন যে নূতন যুগের মানুষ প্রাচীনকালের ধর্মের সঙ্গে তার নূতন বোধের সামঞ্জস্য করতে পারছে না। ''...সে এমন একটি ধর্ম্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম্ম নহে, যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতি দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক যে ধর্ম্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহবান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে

মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্ম্মকে না পাইলে তাহার জীবনসঙ্গীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলি তাল কাটিতে থাকিবে।''[১৪]

মানব ইতিহাসে নব যুগের ধর্মের বিকাশ কিভাবে হয়েছে তা আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ যা বললেন তার সঙ্গে দার্শনিক বেগসঁর-এর গতিবাদের মিল রয়েছে। তিনি বলেন ''...সমস্ত আকাশ জুড়িয়া একটি চিরধারমান মহাযাত্রার লীলা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে --সমস্তই চলিতেছে সমস্তই কেবলি উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকাশ কোনো জায়গাতেই স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই, এক মুহূর্ত্ত তাহার বিরাম নাই; অপরিস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতার অভিমুখে কেবলি সে আপনার অগণ্য পাপড়িকে একটি একটি করিয়া খুলিয়া দিকে দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। এই পরমাশ্চর্য্য নিত্যবহমান প্রকাশ ব্যাপারে মানুষ যে কবে বাহির হইল কে জানে-সে যে কোন্ বাষ্পসমুদ্র পার হইয়া কোন্ প্রাণরহস্যের উপকূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল তাহার ঠিকানা নাই। যুগে যুগে বন্দরে বন্দরে তাহার তরী লাগিয়াছিল, সে কেবলি আপনার পণ্যের মূল্য বাড়াইয়া অগ্রসর হইয়াছে; কেবলি 'শঙ্খের বদলে মুকুতা' স্থূলের বদলে সূক্ষ্মটিকে সংগ্রহ করিয়া ধনপতি হইয়া উঠিয়াছে এ সংবাদ আজ আর তাহার অগোচর নাই।''[১৫] এই বক্তব্যের সঙ্গে বের্গসঁর-এর অভিব্যক্তিবাদের মিল রয়েছে। কিন্তু বের্গসঁর যেখানে বলেছেন যে বিশ্বে কোথাও স্থিতি নেই শুধু গতিই আছে, রবীন্দ্রনাথ বের্গসঁর-এর এই মতবাদ গ্রহণ করেননি। 'ধর্ম্মশিক্ষা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে ধর্মবোধ আমাদের জীবনযাত্রার একপাশে এসে ঠেকেছে, তাকে আমরা বেশী জায়গা ছেড়ে দিতে চাই না। নবযুগের মানুষের জীবনযাত্রায় সরলতা নেই, তার ভোগের আয়োজন যেমন প্রচুর তেমনি তার অভিমানও অত্যন্ত প্রবল। তাই ''...ধর্ম্ম আমাদের অনেকের পক্ষেই সামাজিকতার একটা অঙ্গমাত্র। এমন কি সমাজে এমন লোক দেখিয়াছি যাঁহারা যথার্থ ধর্ম্মনিষ্ঠাকে চিত্তের দুর্ব্বলতা বলিয়া অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।''[১৬]

ধর্মকে গৃহের এককোণে সরিয়ে রাখলে ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষা কিভাবে হবে? স্কুলে, কলেজে, মক্তবে, পাঠশালায়, টোলে মাদ্রাসায় যে যার মতো করে ধর্মমত অল্প পরিমাণে ছাত্রচাত্রীদের শিক্ষা দিতে চান, কিন্তু এ যুগের মানুষ তাতে খুশী নয়। এই

ধর্মশিক্ষা বিষয়ে নানান মানুষ নানারকম আলোচনায় লিপ্ত। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও ধর্মশিক্ষার অভাবে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা কেমন শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন হয়ে উঠেছে। তাই ধর্মশিক্ষা কিভাবে দেওয়া যায় তা চিন্তার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের মতে ''...ধর্ম্মশিক্ষা সহজ। একেবারে নিশ্বাস গ্রহণের মতই সহজ। তবে কিনা যদি কোথাও বাধা ঘটে তবে নিশ্বাসগ্রহণ এমনি কঠিন হইতে পারে যে বড় বড় ডাক্তারেরা হাল ছাড়িয়া দেয়।''[১৭]

রবীন্দ্রনাথ 'নবযুগের ধর্ম্ম' বলতে মানবধর্মকেই বুঝেছেন। তিনি বলেছেন যে বিজ্ঞান বলতে যেমন কোনো বিশেষ দেশের পৃথক বিজ্ঞানকে বোঝায় না, বিজ্ঞান সর্বত্র বিজ্ঞানই। তেমনি ধর্ম বলতে বিশেষ কোনো দেশের বা বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর পালনীয় আচার আচরণ অথবা ধর্মমতকে বোঝায় না। 'নবযুগের ধর্ম্ম' ধর্মশিক্ষার যে আদর্শ তাকেই বদলে দিয়েছে। বিশ্বের মানুষ জন্মসূত্রেই ধর্মের অধিকার লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় মানসিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন --''ধর্মের সংকীর্ণতা ও সমাজের গন্ডিবদ্ধতা হইতে কবি আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য যতই প্রয়াস করুন না কেন --একথা অবশ্যস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মের বুনিয়াদ ব্রাহ্মধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁহার সমাজচেতনা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শাশ্রিত। কিন্তু ব্রহ্মোপাসনাকে লইয়া যখন লোকে সম্প্রদায় গড়িয়া বিরোধ সৃষ্টি করে, যখন ব্রহ্মসাধনা হইতে সমাজবিজ্ঞান মানুষের মনকে জুড়িয়া বসে --তখন কবির পক্ষে কোনো সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন সম্ভব হয় না।''[১৮] ব্রাহ্মধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে একদল ব্রাহ্ম এই ধর্মকে বিশ্বজনীন আখ্যা দিয়ে বললেন যে ব্রাহ্মধর্ম বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের ধর্ম নয়, সকল সম্প্রদায়ের মানুষই এই ধর্মের মধ্যে আশ্রয় পায়। তাঁরা আরো বলেন যে ব্রাহ্মরা ব্রাহ্মই, তাদের হিন্দু আখ্যা দেওয়া যায় না। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের এই মতবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বললেন --''আমরা যে ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম্ম। এই বিশ্বধর্ম্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। শুধু ব্রহ্মের নামের মধ্যে নহে, ব্রহ্মের ধারনার মধ্যে নহে, আমাদের ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যেও একটি গভীর বিশেষত্ব আছেই-এই বিশেষত্বের মধ্যে বহুশত বৎসরের হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব, হিন্দুর যোগসাধনা, হিন্দুর

অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, হিন্দুর ধ্যানদৃষ্টির বিশেষত্ব অতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া আছে।''[১৯] 'আত্মপরিচয়' ভাষণটি ছাত্রসমাজের আহ্বানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পাঠ করেন। এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্ম শাস্ত্র গ্রন্থ হতেই তার আধ্যাত্মিক প্রেরণা পেয়েছে এবং হিন্দু সংস্কৃতির উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তিনি বলেন ''বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দু সমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দুসমাজেরই নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্ম্মান্তিক প্রয়োজনবোধের ভিতর দিয়া তাহারই আন্তরিক শক্তির উদ্যমে এই সমাজ উদ্বোধিত হইয়াছে।''[২০]

রবীন্দ্রনাথ একাদিক্রমে চার বছর পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এই সময়কালে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর পরিমাণে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, গীতিকার এবং সুরকার। তত্ত্ববোধিনী যেহেতু ধর্মীয় পত্রিকা তাই লেখক রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র রচনা সম্ভারের বিচিত্র প্রভাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পড়েনি, আমরা দেখি এই একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য গল্প, উপন্যাস রচনা করে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর জন্য নির্ধারিত ব্রহ্মসঙ্গীত, নূতন সঙ্গীত রচনা, ধর্মীয় প্রবন্ধ, ভাষণ, উপদেশ, বক্তৃতা প্রভৃতি ছাড়া রয়েছে কিছু কবিতা। তবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পর্বে রবীন্দ্রনাথের যে সঙ্গীতগুলি শতধারায় উৎসারিত হয়েছে, তার অধিকাংশ সঙ্গীতই 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। ব্রহ্মের প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ ধ্যানমন্দ্রিত এক ভক্তের পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরিচয় বাংলা সাহিত্যের তথা রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠকের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই বঙ্গে পাঠকসমাজ অবশ্যই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এই অবদান বিনম্র চিত্তে স্মরণ করবেন চিরদিন।

সম্পাদনাকালে পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার সংকলন ও বর্গীকরণ ঃ

আমরা অধ্যায় বিন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্ররচনার সংকলনের কথা বলেছি বটে কিন্তু সমস্ত রবীন্দ্ররচনাই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সে কারণে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলির বর্গীকরণ ও কোন্ কোন্ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার একটি তালিকা তুলে ধরছি। বিশেষ উল্লেখ্যনীয় -- যে দুটি রচনা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত হয়েছে, সেই রচনা দুটি কোনো গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত হয়নি এবং এই রচনা দুটির কোনো পরিমার্জনও হয়নি। সেই দুটি রচনা এখানে তুলে ধরছি। আর এই আংশিক রচনার কারণ সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে জানতে পারি যে --১৮৩৭ শকাব্দের (১৯১৬ সাল) মাঘ মাসে ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতঃকালে রবীন্দ্রনাথ বেদীর আসন গ্রহণ করেন এবং 'সম্বন্ধ ও বন্ধন' বিষয়ে অতীব মনোজ্ঞ উপদেশ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু "... রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতা শ্রীযুক্ত অজিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু বড়ই শেষ মুহূর্তে তিনি অসুস্থতা বশত আসিতে না পারাতে বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিবার কোনই বন্দোবস্ত করিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক আমরা যতদূর সম্ভব তাঁহার অমূল্য উপদেশের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিলাম।" আলোচ্য উপদেশে রবীন্দ্রনাথ বলেন --"যদি কোন কিছু আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখে, কিন্তু আমরা সেটিকে যদি বাঁধিতে না পারি, তবেই তাহা আমাদিগের পক্ষে বন্ধন। কিন্তু যেখানে দুইটি বস্তু পরস্পরকে বাঁধিতে পারে, তখন তাহা সম্বন্ধ নাম পায়। এই সম্বন্ধকে কিছুতেই বন্ধন বলা যাইতে পারে না। পিতার সহিত পুত্রের সম্বন্ধ, স্বামীর সহিত স্ত্রীর সম্বন্ধ, বন্ধুর সহিত বন্ধুর সম্বন্ধ, এগুলি সম্বন্ধ, এগুলিকে কিছুতেই বন্ধন বলা যাইতে পারে না। এই সম্বন্ধ বন্ধনে পুত্রের যেমন কর্ত্তব্য আছে, পিতারও তেমনি কর্ত্তব্য আছে; স্ত্রীর যেমন কর্ত্তব্য আছে, স্বামীরও তেমনি কর্ত্তব্য আছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যে বলিয়া গিয়াছেন 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' তাহা এই সম্বন্ধকে বন্ধন ভাবিয়া কাটাইবার চেষ্টাতেই নানা গোলযোগের উৎপত্তি হইয়াছে। বন্ধনকে আমরা কাটিতে পারি কিন্তু সম্বন্ধকে পারি না। ঈশ্বরের সহিত সংসারের যে সম্বন্ধ, তাহাও সম্বন্ধ তাহা বন্ধন নহে। সেখানে আমাদিগেরও যেমন তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য আছে, তাঁহারও তেমনি আমাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। তিনি করুণার বন্ধনে স্নেহের বন্ধনে আমাদিগকে তাঁহার সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছেন এবং আমরাও প্রীতি দ্বারা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে এই যে আমাদের সম্বন্ধ,

ইহারই অনুশীলনে মানব জন্মের সার্থকতা, ইহারই পূর্ণ উপব্ধিতে মনুষ্যের দেবত্ব।''

১১ই মাঘে প্রাতঃকালীন ব্রহ্মোৎসবে এই উপদেশ প্রদান করার পর সায়ংকালীন সময়ে উদ্বোধন করেন। সেই উদ্বোধনের বক্তব্যও পুরোপুরি প্রকাশিত হয়নি, সম্ভবত ঐ একই কারণে। তাই পত্রিকায় উল্লিখিত হয়েছে --''রবীন্দ্রবাবুর প্রদত্ত উপদেশের দুই চারিটি কথামাত্র আমরা নিম্নে উল্লেখ করিতে সক্ষম হইলাম,''

''পৃথিবীর যেমন গতি আছে, মনুষ্য সমাজেরও সেইরূপ একটি গতি আছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমরা সেই গতির পরিচয় প্রাপ্ত হই। ইউরোপ গত দুই তিন শত বৎসর ধরিয়া তাহার রাজশক্তির প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত করিতেছে। এই রাজশক্তি বিস্তার করিতে গিয়া ইউরোপ যে প্রকার পীড়ন বিস্তার করিয়াছে সে তাহা অনেককাল বুঝিতে পারে নাই। ব্যাঘ্র যখন অন্যপ্রাণীর প্রাণ হরণ করে, তখন সে হিংসার অর্থ বুঝিতে পারে না। কিন্তু দুই ব্যাঘ্র যখন পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহারা হিংসার বেদনা উপলব্ধি করিতে পারে। সেইরূপ যখন বিজিত জাতি, বিজেতার অক্ষুণ্ন তেজ নীরবে সহ্য করে, তখন সেই বিজিত জাতি আপনাকে দলিত ও পীড়িত বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাকে বটে, কিন্তু সেই দলন ও পীড়নের ভার বিজেতা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান মহাসমর বিজেতাকেও পীড়নের মর্ম্মচ্ছেদী যাতনা উপলব্ধি করিবার অবসর প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছে। জয় পরাজয়ের পর্য্যায়ক্রম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। যখন এই দলন পীড়নের যাতনা ইউরোপের দেশ ও জাতি সমূহকে গভীরভাবে স্পর্শ করিবে, তখনই জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটী গভীর আকাঙ্খা অভিব্যক্ত হইয়া পড়িবে। এই যে ভীষণ সমর যাহার বহ্নিকণা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, ঈশ্বরের রাজ্যে নিরর্থক হইতে পারে না। ইহা একপ্রকার সুনিশ্চিত যে এই মহাসমরের অবসানেই হউক অথবা এইরূপ আরও দুই একটি ভীষণ বিপ্লবের পরেই হউক, সমস্ত জগতে এমন এক শান্তির রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহা সুদূর ভবিষ্যতেও অটল অচল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, যাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এক সময়ের ভারতবর্ষের স্বতন্ত্র ভূগোল ছিল, পাশ্চাত্য দেশের স্বতন্ত্র ভূগোল ছিল। ভারতবর্ষের ভূগোলে ক্ষীর সমুদ্র

দধিসমুদ্রের উল্লেখ ছিল, লোকে ভারতবর্ষকে জম্বদ্বীপ প্রভৃতি কয়েকটি দ্বীপে বিভক্ত বলিয়া জানিত। কিন্তু সেদিন আর নাই। এখন একই ভূগোল ভারতবর্ষ ও ইউরোপের পক্ষে, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে যে প্রভেদ ছিল, তাহা সরিয়া যাইতেছে। একই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত জনপদ স্বীকার করিয়া লইতে শিখিয়াছে। সমস্ত জগৎ হইতে একটা মহা বিশ্বজনীন সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে ভারতের ব্রহ্মজ্ঞান এই বিজিত জাতির মধ্যে যাহার পুনরভ্যুত্থান দেখা দিয়াছে, তাহাই অচির ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে। ইহার পূর্ব্বে সূচনা আমরা ইতিমধ্যেই চারিদিকে দেখিতেছি। ফল যখন পাকিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার একদিক সামান্য লাল হইয়া ওঠে। কিন্তু ক্রমে দুই চারিদিন বিলম্বে সমস্ত ফলটাই লাল হয়। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দেখিতে পাইবে যে ভারতের ব্রহ্মজ্ঞান সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিয়াছে। প্রাতঃসূর্য্যের অরুন কিরণে পূর্ব্বদিক আলোকিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু যখন সেই সূর্য্য মধ্যাহ্নগগনে সমুদিত হইবে তখন উহার দীপ্তিতে সমগ্র পৃথিবী দীপ্তিময় হইয়া উঠিবে।''

আলোচ্য উপদেশটি রবীন্দ্রনাথ প্রদান করেন সেই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস ও বীভৎসতার প্রতি লক্ষ রেখে। উপরি উক্ত এই দুটি উপদেশ কোন রবীন্দ্র রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই এই উপদেশের কোনো পরিমার্জনও হয়নি। রবিজীবনী সপ্তম খন্ডে উল্লেখ পাওয়া যায় 'সম্বন্ধ ও বন্ধন' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদানের কথা। সায়ংকালীন উপদেশের উল্লেখও রয়েছে। এর বেশী উল্লেখ আর কোথাও পাওয়া যায় না। সে কারণে এই মূল্যবান উপদেশ দুটি এখানে তুলে দিলাম।

পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্ররচনার বর্গীকরণ। রবীন্দ্রনাথ টানা চার বছর ধরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই সময়পর্বে অন্যান্য রচয়িতাদের বিভিন্ন ধরনের রচনা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁদের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথেরও অনেক ধরনের রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে আমরা শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালের রচনাগুলিরই বর্গীকরণ পৃথক পৃথক সারণির মাধ্যমে দেখাচ্ছি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ঃ

সারণি - ১

১৮৩৩ শকাব্দ (১৯১১ - ১৯১২ সাল)

রবীন্দ্র রচনার শিরোনাম	প্রকাশের কাঁকরণ										অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থের নাম	গ্রন্থের প্রকাশকাল	খণ্ড	পৃষ্ঠা
	সংখ্যা	মাস	বক্তৃতা	প্রবন্ধ	ভাষণ	উপদেশ	সমালোচনা	পত্র	কবিতা	ব্রহ্ম সঙ্গীত	ভ্রমণ কাহিনি				
ব্রহ্মসমাজের সার্থকতা	৮১৩	বৈশাখ	"									শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	ভাদ্র-১৩৯৮ প্রথম প্রকাশ - ১৯০১	২৮	৩৮৭-৩৯৪
বর্ষশেষ	৮১৪	জ্যৈষ্ঠ	"									"	"	"	৪০০-৪০৩
অন্তরের নববর্ষ	৮১৪	জ্যৈষ্ঠ	"									"	"	"	৪০৪-৪০৮
সুন্দর	৮১৫	আষাঢ়	"									"	"	"	৩৯৫-৪০০
বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা	৮১৬	শ্রাবণ	"									"	"	"	৪০৯-৪১১
যিশুচরিত	৮১৭	ভাদ্র	"									রবীন্দ্ররচনাবলী ট্রাষ্ট	বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ১৩৯৮	চতুর্দশ	৩৩৭-৩৪১
পত্র	৮১৭	ভাদ্র						"				রবীন্দ্ররচনাবলী বিবিধ প্রসঙ্গ	বৈশাখ - ১৪১১	১৫/খ	৭৬-৭৭
ধর্ম্মের অর্থ	৮১৮ ও ৮১৯	আশ্বিন ও কার্ত্তিক	"										পৌষ - ১৩৯৫	-	৪৭-৭০
রোমীয় বহু দেববাদের পরিণতি	৮২০	অগ্রহায়ণ		"								রবীন্দ্র রচনাবলী পশ্চিমবঙ্গ সরকার	বৈশাখ ১৪১১	১৫/খ	৩২৭-৩৩০
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়	৮২০	অগ্রহায়ণ	"									পরিচয় / বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	পুনর্মুদ্রণ মাঘ - ১৩৩৮ প্রথম প্রকাশ ১৯১৬	-	৭০-৯৪
বৌদ্ধ ধর্ম্মে ভক্তিবাদ	৮২১	পৌষ					"					রবীন্দ্র রচনাবলী বিবিধ	বৈশাখ ১৪১১ মে-২০০৪	১৫/খ	৩৩০-৩৩৭
ভারত বিধাতা	৮২২	মাঘ								"		গীতবিতান	প্রকাশ	১ খন্ড	২৪৯-২৫০
ধর্ম্ম শিক্ষা	৮২২	মাঘ				"						সঞ্চয় / বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	পৌষ-১৩৯৫ প্রথম প্রকাশ ১৯১৬	-	৭১-১০০
পিতার বোধ	৮২৩	ফাল্গুন				"						শান্তিনিকেতন / বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	ভাদ্র ১৩৯৮	২৮	৪২৯-৪৩৮
আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী	৮২৩	ফাল্গুন						"				রবীন্দ্র রচনাবলী বিবিধ প্রসঙ্গ	বৈশাখ ১৪১১	১৫/খ	৩৩৭-৩৩৯
ধর্ম্মের নবযুগ	৮২৩	ফাল্গুন				"						সঞ্চয় / বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	পৌষ ১৩৯৫	-	৩৩-৪৬
নামকরণ	৮২৪	চৈত্র	"									সঞ্চয় / বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	পৌষ ১৩৯৫	-	২৮-৩২
আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী	৮২৪	চৈত্র						"				রবীন্দ্র রচনাবলী প্রসঙ্গ	বৈশাখ ১৪১১	১৫/খ	৩৩৯-৩৪২

সারণি - ২

১৮৩৪ শকাব্দ (১৯১২ - ১৯১৩ সাল)

রবীন্দ্র রচনার শিরোনাম	প্রকাশের বর্গীকরণ											অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থের নাম	গ্রন্থের প্রকাশকাল সংখ্যা	খন্ড মাস	পৃষ্ঠা বক্তৃতা
	সংখ্যা	মাস	বক্তৃতা	প্রবন্ধ	ভাষণ	উপদেশ	সমালোচনা	পত্র	কবিতা	ব্রহ্ম সঙ্গীত	ভ্রমণ কাহিনি				
আত্ম পরিচয়	৮২৫	বৈশাখ		”								পরিচয় বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	মাঘ - ১৩৩৮ সাল	-	৪৩-৬৮
প্রতীক্ষা	”	”							”			গীতিমাল্য / বিশ্ব ভারতী গ্রন্থালয়	আগষ্ট ১৯২৬ প্রথম প্রকাশ ১৯১৪	-	১২
পরাস্ত	”	”							”			”	”	-	১১
ছুটি	৮২৬	জ্যৈষ্ঠ							”			”	”	-	১৩
রোগীর নববর্ষ	”	”				”						সঞ্চয় / বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	পৌষ-১৩৯৫	-	১-৭
হিন্দু ব্রাহ্ম	”	”				”						রবীন্দ্র রচনাবলী বিবিধ প্রসঙ্গ	বৈশাখ - ১৪১১	১৫/খ	৩৪৩-৩৪৮
শেষ কথা	৮২৭	আষাঢ়							”			গীতাঞ্জলি		-	-
যাত্রার পর্ব্বপত্র	”	”		”								পথের সঞ্চয় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬	-	১-২৬
বোম্বাই শহর	”	”		”								”	”	-	২৭-৩১
গান (এমনি করে ঘুরিব)	”	”								”		গীতিমাল্য/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	আগষ্ট ১৯২৬	-	৪০
আনন্দ রূপ	”	”								”		”	”	-	৪৩
আনন্দরূপ	৮২৮	শ্রাবণ		”								পাথর সঞ্চয় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬	-	৫৮-৬০
যাত্রা	”	”		”								”	”	-	৫১-৫৭
সমুদ্র পাড়ি	”	”		”								”	”	-	৩৯-৫০
গান (এবার তোরা আমার)	”	”								”		গীতমাল্য বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	আগষ্ট ১৯২৬	-	৩৬
আলোছায়া	৮২৯	ভাদ্র								”		”	”	-	৪৪
খেলা ও কাজ	”	”		”								পথের সঞ্চয় বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ	পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬	-	৭৮-৮৭
সত্যবোধ	”	”		”								শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	ভাদ্র ১৩৯৮	২	৪১১-৪১৬

ক্রমশ

সারণি - ২

রবীন্দ্র রচনার শিরোনাম	প্রকাশের কীকরণ											অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থের নাম	গ্রন্থের প্রকাশকাল সংখ্যা	খন্ড মাস	পৃষ্ঠা বক্তৃতা
	সংখ্যা	মাস	বক্তৃতা	প্রবন্ধ	ভাষণ	উপদেশ	সমালোচনা	পত্র	কবিতা	ব্রহ্ম সঙ্গীত	ভ্রমণ কাহিনি				
সমাজভেদ	৮৩০	আশ্বিন						”				পথের সঞ্চয় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬	-	১৫৩-১৬১
সীমার সার্থকতা	”	”						”				”	-	-	১৬২-১৬৮
পরাভব	”	”							”			গীতমাল্য বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	আগষ্ট ১৯২৫	-	৩৯
শুচি	”	”	”									শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	ভাদ্র - ১৩৯৮	২য়	৪২২-৪২৫
ইংলন্ডের ভাবুক সমাজ	৮৩১	কার্ত্তিক		”								পথের সঞ্চয় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬	-	১১৯-১২৮
সীমা ও অসীমতা	”	”		”								”	”	-	১৬৯-১৭৩
লক্ষ্য ও শিক্ষা	৮৩২	অগ্রহায়ণ		”								”	”	-	১৮৩-১৯২
বিশেষত্ব ও বিশ্ব	”	”	”									শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	ভাদ্র-১৩৯৮	২য়	৪২৫-৪২৮
সত্য হওয়া	৮৩৩	পৌষ						”				”	”		৪১৬-৪২০
ইংলন্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রী	”	”						”				পথেট সঞ্চয় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬		১২৯-১৪১
স্বরলিপি (আজি নির্ভয়)	”	”								”		গীতালি বিশ্বভারতী. গ্রন্থালয়	পুনর্মুদ্রণ ১৩৩৩		-
সত্যকে দেখা	৮৩৪	মাঘ	”									শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	ভাদ্র - ১৩৯৮	২য়	৪২০-৪২২
আমেরিকার চিঠি	৮৩৫	ফাল্গুন						”				পথের সঞ্চয় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	পুনর্মুদ্রণ - জৈষ্ঠ ১৩৪৬		১৯৩-১৯৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ঃ

সারণি - ৩

১৮৩৫ শকাব্দ (১৯১৩ - ১৯১৪ সাল)

রবীন্দ্র রচনার শিরোনাম	প্রকাশের বর্গীকরণ											অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থের নাম	গ্রন্থের প্রকাশকাল সংখ্যা	খণ্ড মাস	পৃষ্ঠা বক্তৃতা
	সংখ্যা	মাস	বক্তৃতা	প্রবন্ধ	ভাষণ	উপদেশ	সমালোচনা	পত্র	কবিতা	ব্রহ্ম সঙ্গীত	ভ্রমণ কাহিনি				
যাচাই	৮৩৭	বৈশাখ							”			গীতিমাল্য বিশ্বভারতী, গ্রন্থালয়	পুনর্মুদ্রণ আগষ্ট ১৯২৬	-	৪৬
আমেরিকার চিঠির কয়েকটি অংশ	”	”						”				-	-	-	
বিলাতের পত্র	৮৩৯	আষাঢ়						”				বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ - ২৬	মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬-১৮১১ শক	৩য়	২৭৫-২৭৬
বিলাতের চিঠি	৮৪২	আশ্বিন						চিঠি পত্র				ভক্ত ও কবি অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ পত্র বিনিময়	সম্পাদনা রুদ্র প্রসাদ চক্রবর্তী	-	
ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্য	৮৪৩	কার্ত্তিক						বিলাতের পত্র				-	-	-	
নূতন গান (যদি প্রেম দিলে না)	৮৪৪-৮৪৫	অগ্রহায়ণ ও পৌষ								”		গীতিমাল্য বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	পুনর্মুদ্রণ আগষ্ট ১৯২৬	-	৫৯
গান-নিত্য তোমার	”	”								”		”	”	-	৬০
শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ উদ্বোধন	৮৪৬	মাঘ	”									শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ	ভাদ্র ১৩৯৮	২য়	৪৮২-৪৮৩
৭ই পৌষ প্রাতঃ কালের উপদেশ (মুক্তির দীক্ষা)	”	”				”						”	”	”	৪৮৩-৪৮৬
৭ই পৌষ সায়ংকালের উপদেশ (প্রতীক্ষা)	”	”				”						”	”	”	৪৮৬-৪৮৯
অগ্রসর হওয়ার আহ্বান	”	”					আলোচনা					”	”	”	৪৮৯-৪৯৩
চতুরশীতিতম সাম্বৎসরিক ১১ই মাঘের প্রাতঃকালের উপদেশ (সৃষ্টির অধিকার)	৮৪৭	ফাল্গুন				”						”	”	”	৪৩৯-৪৪৪
সঙ্গীত ভোরের বেলা কখন এসে	”	”								”		গীতিমাল্য বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	পুনর্মুদ্রণ আগষ্ট ১৯২৬		৫১
গাবো তোমার সুরে	”	”								”		”	”	-	৬৮-৬৯
বাজাও আমারে বাজাও	”	”								”		”	”	-	৫৫

ক্রমশ

সারণি - ৩

রবীন্দ্র রচনার শিরোনাম	প্রকাশের বর্গীকরণ											অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থের নাম	গ্রন্থের প্রকাশকাল সংখ্যা	খণ্ড মাস	পৃষ্ঠা বক্তৃতা
	সংখ্যা	মাস	বক্তৃতা	প্রবন্ধ	ভাষণ	উপদেশ	সমালোচনা	পত্র	কবিতা	ব্রহ্ম সঙ্গীত	ভ্রমণ কাহিনি				
জানি গো দিন যাবে	"	”								”		”	”	-	৫৬
তোমায় আমায় মিলন হবে	"	”								”		”	”	-	৭২
আমার মুখের কথা	"	”								”		”	”	-	৬১-৬২
প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে	৮৪৭	ফাল্গুন								”		গীতিমাল্য বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	পুনর্মুদ্রণ আগষ্ট ১৯২৬	-	৫২
আমাদের যাত্রা হল শুরু	”	”								”		-	-		
ছোট ও বড়ো	”	”				”						শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	ভাদ্র - ১৩৯৮	২	৪৪৪-৪৫৭
সঙ্গীত প্রাণ ভরিয়ে তৃষ্ণা	”	”								”		গীতমাল্য বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	পুনর্মুদ্রণ আগষ্ট ১৯২৬		৪৩
প্রভু তোমার বীণা	”	”								”		”	”		৭০-৭১
তোমারি নাম বলব;	”	”								”		”	”		৪৮
আমার সকল কাঁটা	”	”								”		”	”		৬৭
অসীম ধনত আছে	”	”								”		”	”		৪৯
লুকিয়ে আস আঁধার	”	”								”		”	”		৬৫
নয় এ মধুর খেলা	”	”								”		”	”		৫৮
আমার যে আসে কাছে	”	”								”		”	”		৬৩
একটি মন্ত্র	৮৪৮	চৈত্র				”						শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	ভাদ্র- ১৩৯৮	২	৪৭২-৪৮১

সারণি - ৪

১৮৩৬ শকাব্দ (১৯১৪ - ১৯১৫ সাল)

রবীন্দ্র রচনার শিরোনাম	প্রকাশের বর্গীকরণ											অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থের নাম	গ্রন্থের প্রকাশকাল সংখ্যা	খন্ড মাস	পৃষ্ঠা বক্তৃতা
	সংখ্যা	মাস	বক্তৃতা	প্রবন্ধ	ভাষণ	উপদেশ	সমালোচনা	পত্র	কবিতা	ব্রহ্ম সঙ্গীত	ভ্রমণ কাহিনি				
নতুন গান দাঁড়িয়ে আছে তুমি আমার	৮৪৯	বৈশাখ								”		গীতিমাল্য বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	পুনর্মুদ্রণ আগষ্ট ১৯২৬		৯১
এত আলো জ্বালিয়েচে	”	”								”		”	”		৮৭
মনুষ্যত্বেদর সাধনা	”	”				”						রবীন্দ্ররচনাবলী বিবিধ	বৈশাখ ১৪১১ মে-২০০৪	১৫/ খ	৮৫-৮৮
বর্ষশেষ	৮৫০	জ্যৈষ্ঠ		”								”	”	”	৮৮-৯০
নববর্ষ	”	”		”								”	”	”	৯১-৯৪
গান শ্রাবণের ধারার মত	”	”								”		গীতিমাল্য বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	পুনর্মুদ্রণ আগষ্ট ১৯২৬		৮৯
ওদের কথায় ধাঁদা লাগে	৮৫৩	ভাদ্র								”		”	”	-	৯৪
মা মা হিংসীঃ	৮৫৪-৮৫৫	আশ্বিণকার্ত্তিক				”						শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	ভাদ্র ১৩৯৮	২	৮৯৩-৮৯৬
পাপের মার্জনা	”	”				”						”	”	২	৪৯৭-৪৯৯
মন্দিরের উপদেশ	৮৫৬	অগ্রহায়ণ				”						”	”	”	৪৯৯-৫০২
নূতন গান - দুঃখের বরষায় চক্ষের	”	”								”		গীতালি বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	পুনর্মুদ্রণ ১৩৩৩		৩-৪
আমার সকল রসের	”	”								”		”	”	-	১৯
শুধু তোমার বাণী	৮৫৭	পৌষ								”		”	”	-	৩১-৩২
শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ প্রাতঃকালের উদ্বোধন (দীক্ষার দিন)	৮৫৮	মাঘ				”						শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ	ভাদ্র ১৩৯৮	২	৫০২-৫০৪
প্রভাতের উপদেশ আরো	”	”				”						”	”	”	৫০৪-৫০৬
সায়ংকালের উদ্বোধন (আবির্ভাব)	”	”				”						”	”	”	৫০৭-৫০৯
সায়ংকালের উপদেশ অন্তর..... শান্তি	”	”				”						”	”	”	৫০৯-৫১০
১১ই মাঘ প্রাতঃকালের উদ্বোধন (সৌন্দর্য্যের সকরুণতা)	৮৫৯	ফাল্গুন				”						”	”	”	৫৪৮-৪৬০

ক্রমশ

সারণি - ৪

রবীন্দ্র রচনার শিরোনাম	প্রকাশের কালীকরণ											অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থের নাম	গ্রন্থের প্রকাশকাল সংখ্যা	খন্ড মাস	পৃষ্ঠা বক্তৃতা
	সংখ্যা	মাস	বক্তৃতা	প্রবন্ধ	ভাষণ	উপদেশ	সমালোচনা	পত্র	কবিতা	ব্রহ্ম সঙ্গীত	ভ্রমণ কাহিনি				
শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ প্রাতঃকালের উপদেশ অমৃতের পুত্র)	৮৫৮	মাঘ				”						শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ	ভাদ্র- ১৩৯৮	২	৪৬০-৪৬৫
১১ই মাঘের সায়ংকালের উদ্বোধন (যাত্রীর উৎসব)	”	”				”						”	”	”	৪৬৫-৪৬৮
১১ই মাঘ সন্ধ্যার উপদেশ (মাধুর্যের পরিচয়)	”	”				”						”	”	”	৪৬৯-৪৭২
সঙ্গীত অঞ্চলো যে সায়রে	৮৫৯	ফাল্গুন								”		গীতালি বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	পুনর্মুদ্রণ ১৩৩৩ প্রথম প্রকাশ ১৩২১	-	১০
আমাদের দিই তোমার হাতে	”	”								”		গীতিমাল্য বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	আগষ্ট ১৯২৬	-	৯৮
ঐ অমল হাতে রজনী প্রাতে	”	”								”		গীতালি বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়	পুনর্মুদ্রণ ১৩৩৩ সাল	-	৫৭-৫৮
না বাঁচাবে যদি আমায়	”	”								”		”	”	-	৩৯
সহজ হবি সহজ হবি	”	”								”		”	”	-	৬১
মোর সন্ধ্যায় তুমি	”	”								”		গীতিমাল্য বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ	আগষ্ট - ১৯২৬	-	১৩৪
তুমি এসেছ মোর	”	”								”		”	”	-	১০৫
এক হাতে ওর কৃপাণ	”	”								”		গীতালি বিশ্বভারতী গ্রন্থাবলী	পুনর্মুদ্রণ ১৩৩৩	-	২৬
তোমার এই মাধুরী	”	”								”		”	”	-	৫৩
আগুনের পরশমণি	”	”								”		”	”	-	২৩-২৪
মোর হৃদয়ের গোপন	”	”								”		”	”	-	৫৯
মোর মরণে তোমার	”	”								”		”	”	-	৩৫
কর্মযজ্ঞ	৮৬০	চৈত্র										কালান্তর/ রবীন্দ্র রচনাবলী	পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিপ	খন্ড/ ১৩	৬৮১-৬৮৪
আত্মসম্পদ	”	”	”									রবীন্দ্র রচনাবলী পস	”	১৫/খ	৯৯-১০০

পত্রিকায় প্রকাশিত অন্যান্য লেখকের রচনাবলী, তাঁদের রচনা বৈশিষ্ট্য ঃ

রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেন ১৮৩৩ শকাব্দ থেকে ১৮৩৬ (১৯১১ সাল-১৯১৪ সাল) শকাব্দ পর্যন্ত। এই সময়পর্বে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর যেসব লেখকগণ নিয়মিতভাবে তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করেছেন, তাঁরা হলেন শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী। এছাড়া রয়েছেন কয়েকজন মহিলা লেখিকা শ্রীঅতসী দেবী, শ্রীহেমলতা দেবী, শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী প্রভৃতি। নানাকথা বিভাগে রয়েছেন শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে অন্যতম হলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এছাড়াও কয়েকজন লেখক রয়েছেন যাঁরা নিয়মিতভাবে না লিখলেও মাঝে মাঝে কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছেন তাঁদের কথা পরে আলোচনা করব।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যেহেতু ধর্মীয় পত্রিকা অর্থাৎ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ব্রাহ্মধর্মের মুখপত্র হিসেবে, তাই সেদিকে দৃষ্টি রেখেই শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৩৩ শকাব্দের বৈশাখ (১৯১১ সাল) সংখ্যা থেকে ক্রমাগত 'গীতাপাঠ' সম্পর্কে আলোচনা করেন। তবে এই 'গীতাপাঠ' প্রসঙ্গটি পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রমে পঠিত হয়েছিল। গীতাপাঠের আলোচনায় লেখক প্রকাশ করেছেন যে পৃথিবীর সর্বত্র নানাপ্রকার 'ব্যাত্যা' বা নানারূপ বিঘ্ন ঘটছে কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা তাঁর জ্যোতি সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত সমানভাবে বিরাজিত। গীতার ব্যাখা প্রসঙ্গে লেখক সাংখ্যদর্শনের কথা বলেছেন এবং আরো বলেছেন যে সাংখ্যদর্শনের মূল বচনগুলি গীতায় রয়েছে। পরবর্তী সংখ্যায় লেখক বলেছেন যে দুঃখ নিবৃত্তির কি উপায় হতে পারে এ প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য হল অধিকাংশ দুঃখই মানসিক। শারীরিক রোগ ভোগ মানুষের গায়ে সয়। কিন্তু মানসিক রোগের নিবৃত্তি অসম্ভব, আবার মহাপুরুষের অন্তরে রয়েছে আরেক রকমের দুঃখ, সেজন্য চৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব গৃহত্যাগী হয়েছেন। আবার কপিল মুনির বক্তব্য হল প্রকৃতিই নিজের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে মোহে আচ্ছন্ন করে তাকে সুখ

দুঃখাদি গুণদ্বারা বন্ধন করেন। আবার প্রকৃতিই মোহান্ধকার ক্রমে ক্রমে অপসারণ করে সুখ দুঃখাদির হাত থেকে জীবকে সংসারপাশে বদ্ধ করেন আবার বিদ্যামূর্তি ধারণ করে জীবকে মুক্তি ধামে পৌঁছে দেন।

এরূপ আলোচনার পরবর্তী সংখ্যায় আবার গীতাপাঠ প্রসঙ্গের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কখনও বা গীতাপাঠ-এ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সাংখ্যসম্মত তত্ত্বজ্ঞানের সার কথাটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কখনও আবার সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'গীতাপাঠ' প্রসঙ্গের আলোচনাকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একান্তভাবে ধর্মের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখেননি বরং বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনা করে তার মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করেছেন। যেমন ১৮৩৩ শকাব্দ আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যায় 'গীতাপাঠ' প্রসঙ্গে ডারউইনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমাদের কিরূপ ঐক্য অনৈক্য রয়েছে তা আলোচ্য লেখায় পর্যালোচনা করেছেন। পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করেছেন গীতাশাস্ত্রের আদ্যপান্ত জুড়ে গুণ শব্দের নানারূপ ব্যবহার সম্পর্কে। আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক কান্টের মত উল্লেখ করেছেন। কান্টের মতে প্রজ্ঞাকে দুই শ্রেনীতে ভাগ করা যায় - এক Practical দুই Theoritical ।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের 'প্রবন্ধপাঠ সভায়' পঠিত 'গীতাপাঠ'-এ ত্রিগুণের গোড়ার কথা বলতে গিয়ে লেখক প্রথমে সত্ত্বগুণের দুটি অবয়বের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন বটে তবে তিনি গীতার সত্ত্বগুণেরই কার্যকারিতা আলোচনা করেছেন। কখনও 'গীতাপাঠ' প্রসঙ্গে কর্মযোগ নিয়ে আলোচনা করেছেন, এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে বিশ্রাম ভালো, না কর্ম ভালো। এই দুয়ের মধ্যে যদি বোঝা যায় যে বিশ্রাম অপেক্ষা কর্ম ভালো তবে বিশ্রামে জলাঞ্জলি দিয়ে রাত্রিদিন সকাল বিকাল সন্ধ্যা অনবরত পূর্ণ উদ্যমের সঙ্গে কর্মে ব্যাপৃত থাকা উচিত। আবার যদি দেখা যায় কর্ম অপেক্ষা বিশ্রামই শ্রেয় তাহলে কর্ম বাদ দিয়ে দিনরাত বিশ্রাম। অবশেষে বলেছেন যে রাত্রে সুনিদ্রা না হলে দিবসে কর্মে মনোনিবেশ করা যায় না। আবার কখনও গীতাপাঠ প্রসঙ্গে বলেছেন যে ঈশ্বরের রূপ চর্মচক্ষে দেখা যায় না, মনঃশ্চক্ষের সামনে গড়েও দাঁড় করানো যায় না তাই তিনি অপরূপ। ঈশ্বরের মূর্তি কল্পনা সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রের মর্মগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এইভাবে একাদিক্রমে ১৮৩৩ শকাব্দ থেকে ১৮৩৫ শকাব্দ গীতার বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১৮৩৬ শকাব্দের ৭ই পৌষের উৎসবে যে উপদেশ প্রদান করেন, তা ১৮৩৬ শকাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া এই শকাব্দে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর কোনো রচনা প্রকাশিত হয়নি। ইতিপূর্বে 'গীতাপাঠ' প্রসঙ্গে সর্বশেষ লেখাটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ শকাব্দের চৈত্র সংখ্যায়। এখানে বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। লেখক বলেছেন যে - প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, বাস্তবিক সত্তাই বস্তুসকলের জ্ঞেয়ত্বের নিদান। 'জ্ঞেয়ত্ব' কিনা অগোচরে প্রকাশ যোগ্যতা।

গীতাশাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের যেসকল নিগূঢ় কথা প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাই লেখক ব্যক্ত করেছেন -- তাঁর রচিত গানের মাধ্যমে।

উচ্চে নীচে দেশ দেশান্তে জলগর্ভে কি আকাশে
অন্ত কোথায় তাঁর অন্ত কোথায়
তাঁর এই কথা সবে জিজ্ঞাসে হে
কর তাঁর নাম গান
যতদিন রহে প্রাণ।

সাময়িকপত্র পরিচালনা করা একদিকে যেমন মহানদায়িত্ব অন্যদিকে তেমনই কঠিন কাজ। কারণ দু একজনের সহায়তায় বা দু একজনের রচনার দ্বারা নিয়মিতভাবে পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব নয়। তাই পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার জন্য যেমন বিজ্ঞজনের সহযোগিতা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন বিজ্ঞজনের পরামর্শ এবং রচনা। তবে কে সাহিত্যিক আর কে সাহিত্যিক নয় তা দু-একটি রচনার দ্বারা বিচার করা সম্ভব নয়। ক্রমাগত লেখনী চালিয়ে যান যাঁরা, যাঁদের রচনার বৈচিত্র্যে পাঠককুল আকৃষ্ট হন কালক্রমে তাঁরা ভাবীকালের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন। এই হয়ে ওঠার কাজটাই সুষ্ঠুভাবে সমাপন করে থাকে সাময়িক পত্রিকা। সাময়িক পত্রিকায় নিয়মিত লেখনীর মাধ্যমেই যথার্থ সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। সেজন্য কোন ব্যক্তির সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পিছনে সাময়িকপত্রের অবদান অনেকখানি। সাময়িকপত্রের হাত ধরেই অনেক

লেখক প্রচারের আলোয় উঠে আসেন। দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের 'অভিলাষ' কবিতা প্রথম ছাপার অক্ষরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হলে অনেক পাঠক বালকের কবিতা পাঠ করে ভাবীকালের একজন কবির কবি হয়ে ওঠার পূর্বাভাষ পেয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের প্রথমদিকে অনেক প্রখ্যাত সাহিত্যিকেরা তাঁদের মূল্যবান রচনার দ্বারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কলেবর পুষ্ট করেছেন, গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। এই সকল সাহিত্যিকেরা হলেন - মহাত্মা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যেসকল মহিলাকবি নিয়মিতভাবে কবিতা রচনা ও প্রকাশের দ্বারা পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রিয়ম্বদা দেবী। ইনি একজন কবি এবং বিদূষী মহিলা। ইনি ক্রমাগত তিন বছর ধরে একদিকে কবিতা এবং অন্যদিকে নানা বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা-পর্যালোচনা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেছেন। প্রিয়ম্বদা দেবীর রচনা একদিকে যেমন সংখ্যায় প্রচুর তেমনি বিষয় বৈচিত্র্যেও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তবে তাঁর রচিত কবিতা এবং অন্যান্য গদ্যাংশ রচনার মধ্যে ঈশ্বরানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর দু'একটি রচনা আলোচনা করলে লেখিকার মানসিকতাকে একটু ছোঁয়া যাবে। যেমন ১৮৩৩ শকাব্দ বৈশাখ সংখ্যায় (১৯১১ সাল) প্রকাশিত হয়েছে 'সাধুবাক্য' রচনাটি। এই রচনায় লেখিকা জগৎবাসীকে বৎস বা সন্তানরূপে স্নেহমিশ্রিত সম্বোধনের মধ্য দিয়ে তাদের সমস্ত রকম প্রলোভন ত্যাগ করে ঈশ্বরের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন পরম করুণাময় ঈশ্বর মানবের সুখ দুঃখ প্রিয় অপ্রিয় লাভ ক্ষতি যা কিছু দান করেছেন মানবের উচিত সেটুকুকেই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। যেকোনো পরিস্থিতিতে সন্তোষ ও ধৈর্য রাখতে হবে। মঙ্গলময় বিধাতা যে বিপত্তি বা দুঃখই দিন না কেন বিশ্বস্ত হৃদয়ে বিনম্র চিত্তে গ্রহণ করলে তাতে মানবের উপকারই হবে।

১৮৩৩ শকাব্দ থেকে ১৮৩৫ শকাব্দ পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে 'ভক্তবাণী'। রচনার নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে ভক্তের প্রতি গুরুর বাণী বা উপদেশই এই রচনার মূল বিষয়। তবে ১৮৩৫ শকাব্দ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সুখ-মৃত্যু' রচনাটি ঈশ্বরানুভূতি থেকে দূরে সরে গিয়ে এক নিরপেক্ষ স্থানে অবস্থান করছে। লেখিকা ব্যক্ত করেছেন যে দৃশ্য ও শ্রাব্য জগতের সংস্পর্শে তাঁর মনে যে অনুভূতি জাগে তা লিপিবদ্ধ করবার অভ্যাস তাঁর নেই। কিন্তু পর্বতবেষ্টিত নিঃসঙ্গ কুটীরে বসে তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। পর্বতশৃঙ্গে সূর্যোদয় দর্শন প্রসঙ্গে লেখিকা যে ভাব ব্যক্ত করেছেন তাহল তাঁর জীবনে তিনি যত সূর্যোদয় দেখেছেন; তার সঙ্গে বর্তমান কালের সূর্যোদয়ের কোনো তুলনাই হয় না।

প্রিয়ম্বদা দেবীর বেশ কিছু কবিতা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিছু কবিতায় ঈশ্বরানুভূতির ভাব ব্যক্ত হয়েছে --যেমন 'পূজা', 'দুঃসাহসী', 'অভিন্ন', 'মঞ্জরী' প্রভৃতি কবিতা। আবার 'চেতনা' কবিতায় লেখিকার ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা ব্যক্ত হয়েছে। নিস্তব্ধ রাতে একা বসে লেখিকা আকাশের দিকে চেয়ে দেখছেন। সেখানে একে একে তারারা উঠেছে অন্ধকার ভেদ করে। কিন্তু লেখিকার বুকে এমনই এক আলো ধ্রুব তারার মতো অম্লান হয়ে আছে। 'মনোরথ' কবিতায় কবি ছেলেবেলাকার কথা বলেছেন যখন দিন ফুরাত, দিনের আলোয় পশ্চিম আকাশে সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়ত। মাঠের শেষ প্রান্তে যেখানে আকাশটা গিয়ে মিলে যেত সেখানে তাঁর যেতে ইচ্ছে হ'ত। তাঁর মনে হ'ত সেখানে বুঝি সব কামনা বাসনা পূর্ণ হবে। 'সন্ধ্যায়' কবিতায় কবির যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা'হল প্রভাতের ছায়া সামনের দিকে প্রসারিত হয়ে কত আশার বাণী শুনিয়েছে লেখিকার শিশির কোমল মনে। মধ্যাহ্নের খর্ব ছায়ায় সব আশালতা শুকিয়ে গেছে। আর সূর্যাস্তের সময় ছায়া দীর্ঘ হয়, গোধূলির মোহ কাটে। সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে যায়, সপ্তর্ষিমন্ডল আর ধ্রুব তারা জেগে থাকে। এসব কবিতায় ঈশ্বরানুভূতি থেকে সরে গিয়ে দূরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আজ থেকে শতবর্ষপূর্বে একজন মহিলা কবি যিনি তাঁর কবিতায় এবং বিভিন্ন গদ্যরচনার মধ্য

দিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাঠকদের বিচিত্র স্বাদের আশ্বাস দিয়েছেন, এখানেই লেখিকার স্বকীয়তা।

হেমলতা দেবী -- রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যাঁরা নিয়মিতভাবে নিজেদের বহুমুখী রচনা সম্ভারে পত্রিকার শ্রী বৃদ্ধি করেছেন, হেমলতা দেবী তাঁদের অন্যতম লেখিকা। এই মহিলা কবি একদিকে কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে যেমন পাঠকের মনের খোরাক যুগিয়েছেন তেমনি বিভিন্ন গদ্যরচনার দ্বারা পত্রিকার কলেবর পরিপুষ্ট করেছেন। ঈশ্বরের প্রতি অপরিসীম ভক্তি ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় হেমলতাদেবীর রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর কবিতা গুলিকে দুটিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক ঈশ্বর ভক্তি বিষয়ক এবং দুই সাধারণ বিষয়ক। যেমন -১৮৩৩ শকাব্দ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি। এই কবিতায় লেখিকা প্রকাশ করেছেন যে পৃথিবীতে জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আসা আর যাওয়ার প্রবাহ চলেছে অবিরত। তবু মানুষ তার নিজের মোহ ত্যাগ করতে পারে না, জীবন ক্ষণস্থায়ী জেনেও। এই জগতে মানবের আসা যাওয়া আলো আঁধারের মধ্যে কোনো এক পরম পুরুষ বীণ বাজায়। যাকে দেখে মোহের স্বপন ভেঙ্গে যায় আর পরম পুরুষের সান্নিধ্য লাভ হয়। 'সাধনার ধন' কবিতায় যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা হ'ল যিনি সকল প্রকরণ জড়ো করে রেখেছেন, যিনি সবার দুঃখে দুঃখী, যাঁর অবারিত হস্ত সর্বত্র প্রসারিত তাঁকেই লেখিকার হৃদয় খুঁজে বেড়ায়। এই রকম ঈশ্বরানুভূতির কবিতা হল 'দীপাঞ্জলি', 'নিরানন্দ', 'পূজা' প্রভৃতি। আবার কিছু কবিতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে। যেমন 'কর্মসাধনা', 'পরিণতি', 'অভিজ্ঞতা', 'জানাকথা' এবং 'কবিতা'। 'পরিণতি' কবিতায় হেমলতা দেবী জীবনকে ফুলের সঙ্গে সুন্দরভাবে তুলনা করেছেন। কিন্তু ফুলের সার্থকতা ফোটার মধ্যে আর জীবনের সার্থকতা আরো বৃহৎ আরো ব্যাপক। জীবফুলের ফলের পরিচয় কেউ রাখে না। 'অভিজ্ঞতা' কবিতায় লেখিকা নিজের পরীক্ষা নিয়ে দেখবেন যে কোথায় তার সত্য আছে, আর তাকে কি শিক্ষাই বা দিল, জীবনের সুখই বা কি আর জীবনের আনন্দই বা কিসে, যাকে লেখিকা তাঁর নিজের লোক মনে করেন, সে কেমন লোক, যাকে লেখিকার ভালো লাগে না। কঠিন বিচার করে তাঁকে নিজের

হৃদয় ভেদ করে বার করতে চাইছেন। এমনই ভক্তি নিরপেক্ষ আর একটি কবিতা 'জানাকথা' যাতে ব্যক্ত হয়েছে যে মানুষ শুধু নিতে চায়, দিতে চায় না।

হেমলতা দেবীর গদ্যরচনাগুলিও ধর্মীয় ভাবাবেগ থেকে লেখা। যেমন পারস্যে সুফী শাস্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ থেকে নেওয়া 'সুফীদের ভ্রমণ'। নামকরণ থেকেই বিষয় সম্পর্কিত ধারণাটি পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। তবু দু এক জায়গায় বলা যায় যে উদ্দাম প্রবৃত্তির দমন ও হৃদয়ের কাঠিন্য কোমল করবার পক্ষে ভ্রমণ বিশেষ ফলদায়ক। ভ্রমণের দ্বারা স্বভাবের বিকৃতি ও অন্তরের কর্কশতা ক্ষয় হয়ে ভক্তির পবিত্র সরসতা প্রকাশ। এইরূপ 'খিলবৎ' রচনায় প্রকাশ করেছেন ঈশ্বরের সাধনা ছাড়া মানবের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য আর কিছু নেই। ঈশ্বর স্বর্গে মর্তে বিরাজমান, তাঁকে উপেক্ষা করে যিনি অন্য পদার্থ কামনা করেন তিনিই কলুষিত। এবং হৃদয়কে কলুষ মুক্ত করতে হলে কৃচ্ছ্র সাধন করা প্রয়োজন। কি উপায়ে এই কলুষ মুক্ত হয় তার উপায় বর্ণিত হয়েছে। এইভাবে ১৮৩৩ শকাব্দ থেকে ১৮৩৫ শকাব্দ পর্যন্ত হেমলতা দেবীর বিভিন্ন রচনা নিয়মতিভাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যে তিনজন মহিলা লেখিকা তাঁদের রচনার দ্বারা পত্রিকার সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন তাঁদের আর একজন হলেন লেখিকা অতসী দেবী। খুব বেশী সময়কাল পর্যন্ত অতসী দেবীর রচনা প্রকাশিত হয়নি। ১৮৩৩ শকাব্দের প্রথম কয়েকটি সংখ্যায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই অল্প সংখ্যক রচনার মধ্য দিয়েই বিষয়গত দিক থেকে এবং মননের দিক থেকে বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৩৩ শকাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'জাতির স্বাতন্ত্র্য'। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই শকাব্দেই শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'শীলশিক্ষা' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে লেখিকা প্রকাশ করেছেন যে আমাদের শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে শীলশিক্ষার স্থান না থাকাতে কিরূপ কুফল ঘটেছে। তিনি বলেছেন আধুনিক যুগে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করেছে। তখনকার সাহিত্য ক্ষীণ কলেবর হলেও তা ভাবের সম্পদে ঐশ্বর্যশালী ছিল। তার মধ্যে অল্পের ভিতর খাঁটি জিনিসটি পাওয়া যেত। এই রচনার

পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় 'হাতীর দন্ত চিকিৎসা' এবং 'ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল' প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়ে লেখিকা বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একজন প্রধান লেখক হলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। ইনি ১৮৩৩ শকাব্দের ভাদ্র সংখ্যা থেকে ১৮৩৬ শকাব্দ (১৯১১ সাল-১৯১৪ সাল) পর্যন্ত ক্রমাগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মূল্যবান সব প্রবন্ধ, গ্রন্থ, সমালোচনা, সাহিত্যালোচনা, ধর্মীয় প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা করেছেন। ১৮৩৩ শকের ভাদ্র সংখ্যাতে 'ইউরোপে নব ধর্ম্মান্দোলন' প্রবন্ধে ইউরোপে নব ধর্মান্দোলনের কথা বলতে গিয়ে লেখক রামমোহনের কথাই অধিক সময় ধরে বলেছেন। সেই প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছেন যে ইউরোপে আধুনিককালে যে ধর্মান্দোলন চলছে তা অনেক আগেই রামমোহন ব্যক্ত করেছেন। তারপর খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে আধুনিকালের অভিযোগগুলির আলোচনা করেছেন। এই সংখ্যাতেই অজিতকুমার 'উপনিষৎ' প্রবন্ধে বলেছেন যে পাশ্চাত্য পন্ডিতরা উপনিষদ নামক গ্রন্থ প্রকাশ করলেও আমাদের দেশে তার অভাব ছিল। আলোচ্য রচনা দুটি ধর্মীয় অনুষঙ্গের রচনা হলেও, ১৮৩৩ শকের আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'কাব্যের অধিকারের প্রসারতা' প্রবন্ধে কাব্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধনা' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে লেখকের বক্তব্য হল যে ধর্ম জগতে দু শ্রেণির লোক দেখতে পাওয়া যায়। একশ্রেণীর লোক নীতিপরায়ণ, অন্য শ্রেণির লোক ভক্তিপরায়ণ। একজন কেবলই কাজ করছেন, কাজ করেও শেষ করতে পারছেন না, যেমন ইংরেজ পাদ্রি। ইনি অনেক সৎকর্ম করেন, তাতে সন্দেহ নেই। গরীবদের শিক্ষা অন্নবস্ত্রের জন্য তিনি সর্বদাই খাটেন। দুর্নীতি দূর করারও চেষ্টা করেন। নিজের কর্মের মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে আছেন যে ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণারও সময় নেই। আবার অন্যজন অল্পই কাজ করেন, কাজ করতে করতে আত্মবিস্মৃত হয়ে জমাখরচের হিসাব খাতায় উক্তির উচ্ছ্বাসকে লিপিবদ্ধ করেন। কাজ তাঁকে কোথাও পেয়ে বসে না, তিনি ভগবানের মাধুর্য রসে নিমগ্ন থাকেন। যেমন রামপ্রসাদ সেন।

অতঃপর আবার গ্রন্থ সমালোচনা। ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক অনুবাদিত কবীরের গ্রন্থাবলীর সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সাহিত্যের কথাও বলেছেন। এই শকাব্দেই ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'বৈচিত্র্যের সমস্যা'। এই প্রবন্ধে লেখকের যে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে তা হ'ল পূর্বকালের মানুষের মধ্যে অখন্ডতাবোধ থাকলেও বর্তমানকালের মানুষ বহুধায় বিভক্ত। এখনকার কালের মানুষ এক নয়, সে নানা মানুষের সমষ্টি, আর এখানেই তার সমস্যা সাহিত্যের সব শাখাতেই অজিতকুমার চক্রবর্তীর অবাধ প্রবেশধিকার ছিল। 'বৈচিত্র্যের সমস্যা' প্রবন্ধটিতে তাঁর যথেষ্ট পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'আর্ট' এবং পরের সংখ্যায় প্রকাশিত 'সত্য ও সমন্বয়' রচনার মধ্য দিয়ে যথেষ্ট বৈদগ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। 'সৌন্দর্য্য ও মহিমা' প্রবন্ধে লেখক ইংলন্ডের প্রকৃতির সঙ্গে বাংলাদেশের প্রকৃতির তুলনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে উভয় দেশের প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। বাংলাদেশের প্রকৃতি আমাদের দেশের কবিদের উদাসীন করে দেয়, উন্মনা করে দেয়, কিন্তু ইংলন্ডের প্রকৃতির মত সৌন্দর্যের ভাব জাগায় না। ইউরোপীয় সাহিত্যে ''দূরে কোথায় দূরে দূরে ...'' এই অনির্বচনীয় ভাব অপেক্ষা সৌন্দর্য উপভোগের আনন্দ ও সৌন্দর্য মুগ্ধতার ভাব অনেক বেশী প্রবল। সৌন্দর্য ও মহিমার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে লেখক বলেছেন যে সৌন্দর্য অনুভবের জিনিস তা কার্যকারণের নিয়ম খাটিয়ে অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করতে হয় না; এবং নানা কাজে কর্মে ফলিয়ে তুলে মনুষ্যের প্রয়োজন সাধন করতেও হয় না, আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক আরো উল্লেখ করেছেন যে ইংরেজ কবি সুন্দর ও মহানকে পৃথকভাবে দেখেছেন। তাঁর মতে সৌন্দর্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে এবং মহিমা আমাদিগকে বিস্মিত করে, উন্মনা করে; সুতরাং এরা দুই রসে মনকে রসায় বলে এরা একই সৌন্দর্যের শ্রেণিভুক্ত হতে পারে না। এই ভাবে 'নাট্যকার মেটারলিঙ্ক', 'কর্মসৃষ্টি', 'কবিতা', 'আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে কবি ইয়েট্‌সের অভিমত', 'সাহিত্যে শৈশবের স্থান', 'ধর্ম্ম ও সাহিত্য', 'অধ্যাপক অয়কেনের লেখা', 'জন্ম', 'গণতন্ত্রতায় সংযমের স্থান', 'চীন ও জাপান', 'অখন্ড জীবন', 'জাতি সংঘাত', 'মিষ্টিসিজম,' 'বিশ্বসংবাদ', 'এডমন্ডহোমসের কবিতা',

'রামজে ম্যাকডোনাল্ডের বক্তৃতা', 'ইউরোপের ইতিহাসের ধারা প্রথম প্রস্তাব', এছাড়া 'ব্রাহ্মসমাজের সমস্যা', 'ব্রাহ্ম ও হিন্দু', 'বাংলা সাহিত্যে সামাজিক প্রসঙ্গ' প্রভৃতি বহু বিচিত্র বিষয়ের প্রবন্ধ রচনা করে একদিকে যেমন পাঠককুলের নিত্যনতুন চাহিদা মিটিয়েছেন, অপরদিকে পত্রিকার কলেবর পুষ্ট করেছেন। 'ইউরোপের ইতিহাসের ধারা প্রথম প্রস্তাব' এই প্রবন্ধটি ব্রহ্মবিদ্যালয়ে সান্ধ্য বক্তৃতা সভায় পাঠ করা হয়েছিল। বহু বিচিত্রমুখী তাঁর প্রতিভা। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ, এইরূপ নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আর একজন লেখক ক্ষিতিমোহন সেন খুব বেশী পরিমাণে রচনা প্রকাশ করেনি। কিন্তু রচনার পরিমাণ অল্প হলেও বিষষের দিক থেকে বৈচিত্র্য যথেষ্ট রয়েছে। 'দাদূ' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক দাদূর পরিচয়ে বলেছেন যে ইনি কবীর পুত্র কমালের শিষ্য। এই রকম হিসাব ধরলে দেখা যাবে ইনি আকবরের অনেক পূর্বের ব্যক্তি। কিন্তু দবিস্তান মতে ইনি আকবরের সময়কার লোক। 'দাদূ' কাশীর কাছে জৌনপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে মুচী ছিলেন। কমাল একে ধর্মীয় দীক্ষা দান করেন। দাদূ লেখাপড়া না জানলেও তপস্যার অগ্নিতে জ্ঞানের ও প্রেমের গভীরতম ক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করে অতিশয় আশ্চর্যভাবে তত্ত্বরাজ্যে এক অপরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করেন। তাঁর বাণীগুলি অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর। কবীর-এর অনেক বাণীই আবার নূতন করে লিখেছেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের প্রতিই দাদূর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ইনি ব্রহ্মাকেই গুরু বলে জানতেন।

পরবর্তী আরও কয়েকটি সংখ্যায় 'দাদূ', 'কবি' এবং 'মহবুবী' ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'মহবুবী' প্রসঙ্গে বলেছেন মুসলমান ধর্ম যখন ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হয় তখন তা কোরাণ প্রতিপালিত মহম্মদের খাঁটি ধর্মই ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়। মুসলমান সমাজে তার পূর্বে যে সম্প্রদায় উপসম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলি ভারতেও এসে প্রবেশ লাভ করে। তার মধ্যে মহবুবী সম্প্রদায় ছিল, সে সম্পর্কিত আলোচনাও এখানে রয়েছে। ক্ষিতিমোহন সেনের যে কয়টি রচনা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়েছে, তা সংখ্যায় অল্প হলেও সেগুলি কোনো না কোনো ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

১৮৩৫ শকাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'তীর্থ যাত্রা' প্রবন্ধ, এই প্রবন্ধে উপনিষদের ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে। এই শকের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত 'উদ্বোধন' আদি ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসবে সন্ধ্যাকালে পঠিত হয়। ঈশ্বরের পরশে দিবাবসানে ধরণীতে কিভাবে শান্তি বিরাজ করে সে সম্পর্কিত অনুভবের কথা এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

তত্ত্ববোধিনী ধর্মীয় পত্রিকা এই ভাবনা থেকে অনেকেই বেরিয়ে আসতে পারেননি, তাই তাঁদের রচনায় কোনো না কোনো ভাবে ধর্মীয় অনুষঙ্গ এসে গেছে। এই রকম রচনা যে কয়জন লেখকের রচনার মধ্যে পাওয়া যায় ক্ষিতিমোহন সেন তাঁদের অন্যতম।

১৮৩৩ শকাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৩৬ শকাব্দ পর্যন্ত ক্রমাগত বিচিত্র বিষয়ে রচনা প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের প্রচুর গানের স্বরলিপি করেছেন এবং নিজে কবিতা লিখে নিজেই তার সুর দিয়েছেন, স্বরলিপি তৈরী করেছেন যিনি, তিনি হলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিষয় বৈচিত্র্যে তাঁর রচনাগুলি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দিনেন্দ্রনাথ কখনও 'সুফী ধর্ম্ম' প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন তো কখনও আবার 'নববর্ষের প্রার্থনা' কবিতা প্রকাশ করছেন। 'সুফি ধর্ম্মমত' নিয়ে বেশ কয়েকটি রচনা প্রকাশ করেছেন। কখনও আবার ধর্মের প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে প্রকাশ করেছেন 'অন্ধের দৃষ্টিলাভ', এই রচনাটি একেবারে ভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা। এতে বলা হয়েছে 'ফারমার জন্' নামে এক ব্যক্তি জন্মান্ধ কিন্তু পরে ডাক্তাররা তার চোখের ছানি কেটে দৃষ্টি দান করলে পূর্বের জীবন ও পরবর্তী জীবনের আচরণের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। এরপর কবিতা 'ব্যর্থতা', 'বর্ষা আবাহন' দুটি কবিতারই বিষয়য়বস্তু ভিন্ন প্রকৃতির। 'ব্যর্থতা' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন সমস্ত মানব পরমেশ্বরকে ভুলে নিজের মধ্যে মত্ত হয়ে রয়েছে। সংসার বন্ধনে যে জটিলতা তা থেকে অনন্তের অনুভূতি জাগে না। 'বর্ষা আবাহন' কবিতায় বর্ষাকে ধরণীর প'রে অবতরণের জন্য আহবান জানিয়েছেন। সুফীধর্মের পর 'বাবীধর্ম'

নিয়ে আলোচনা করেছেন বেশ কয়েকটি সংখ্যায়। দিনেন্দ্রনাথের মধ্যে যে একটি সুপ্ত কবি প্রতিভা ছিল যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বারে বারেই। ১৮৩৪ শকাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে 'আঁধারের ধন' কবিতা, কবির অনুভূতির কথা এই কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে কবির চোখ চেয়ে আছে পক্ষপানে, কিসের সন্ধানে তা কবির জানা নেই। প্রচন্ড অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে সমগ্র আকাশ ব্যথায় ভরে আছে। রজনী তার দীপগুলিকে জ্বালাতে গিয়েছে। হৃদয়ে আশাদীপ জ্বলে ওঠে কোন এক গগন-তলে যেখানে মন যেতে চায় সেখানে শূন্য ছাড়া কিছু নেই। ''বল শুধু আছে আছে এই তো হৃদয় বাঁচে।'' পরের সংখ্যায় বিজ্ঞানসম্মত লেখা 'বিষাক্ত গাছ' যা 'Science from an easy chair' নামক পুস্তক থেকে সংকলিত। এমনিভাবে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অন্যতম লেখক দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন বিষয়ের রচনার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন পাঠকদের বৈচিত্র্যের আস্বাদ দিয়েছেন তেমনি লেখকেরও বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে এই সমস্ত রচনার মধ্য দিয়ে।

তত্ত্ববোধিনী ধর্মীয় পত্রিকা, একথা মাথায় রেখেই অধিকাংশ লেখক তাঁদের রচনা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেছেন। নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও অন্যান্য লেখকদের মতো করেই প্রথম রচনা 'প্রেমের লক্ষণ কি কি? প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেন। এই রচনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রেমের কথাই প্রকাশিত হয়েছে। যিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন তিনি সেই পরম ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে চান, কিভাবে সে মিলন হবে সেকথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। এই একটিমাত্র ধর্মীয় রচনা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশের পরই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ধর্মীয় অনুষঙ্গ থেকে সরে গিয়ে ভিন্ন স্বাদের রচনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে গোটাবিশ্বকে তত্ত্ববোধিনী পাঠকের দরবারে হাজির করিয়েছেন।

১৮৩৩ শকাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'সমবায়-কৃষি-সমিতি'। ইংলন্ডে সমবায় কৃষিসমিতি কেন স্থাপিত হল সে বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। বাণিজ্য প্রিয় জাতি ইংরেজ অনুভব করে যে ইংলন্ডের পল্লীগ্রামের অবস্থা ক্রমেই হীন হয়ে পড়ছে। বাণিজ্য ও শহরের নানাপ্রকার উত্তেজনা শ্রমজীবীদের শহরে টেনে আনার ফলে কৃষি উন্নতির

পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে এসেছে। এই সমস্যার সমাধানকল্পে সমবায় কৃষিসমিতি স্থাপিত হয়েছে।

পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত' প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে আমেরিকায় কিভাবে কৃষি উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে ভারতীয় ও জাপানী কৃষকদের কথাও আলোচিত হয়েছে। এই একই সংখ্যায় 'বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা' প্রকাশিত হয়। এই রচনার বিষয় - কোথায় কোথায় বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে সে সম্পর্কিত আলোচনা। এই একই সঙ্গে 'রক্তসঞ্চালন', 'নক্ষত্রের সংঘাত', 'উদ্ভিদের সংজ্ঞানাশ' প্রভৃতি বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। এই শকাব্দেই ভাদ্র সংখ্যায় নানাকথা বিভাগে 'ওলাউঠার প্রতিশেধক' সম্পর্কে এবং 'উচ্চ হইতে পতন' সম্পর্কে আলোচনায় বলেছেন যে উচু থেকে পড়ে গেলেও অনেক সময় মানুষের মৃত্যু হয় না। নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একদিকে যেমন 'কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত' প্রসঙ্গে আয়ার্ল্যান্ড, ডেনমার্ক, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তেমনি 'নানাকথা' বিভাগে কখনও 'আমেরিকার চীনজয়', 'অঙ্কুরোৎপত্তির তত্ত্ব', 'কাঁচামাংস চিকিৎসা', 'লৌহের জমা খরচ', 'উপসাগরীয় সম্বন্ধীয় দু একটি কথা', 'নিঃশব্দ গৃহ', 'পাকস্থলীর সহিষ্ণুতা' এককথায় বলা যায় যে রচনার বিষয় বৈচিত্র্যে নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। ধর্মের গন্ডি থেকে বেড়িয়ে এসে সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষভাবে এত বিষয় বৈচিত্র্যের দ্বারা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার 'বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা' বিভাগে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তাও খুব মূল্যবান। সাহিত্য বিষয়ক রচনা প্রকাশের পাশাপাশি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনা পাঠকের রসবোধকে বিভিন্ন দিক থেকে পরিতৃপ্ত করেছে। 'ইক্ষুদন্ড হতে মোম প্রস্তুত', 'মরুভূমিতে উদ্ভিদের জলদান' কিংবা 'চোরাবালি'র রূপ কেমন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার 'বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা' বিভাগে বিভিন্ন রচনা প্রকাশের মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পত্রিকায় এই সব বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আরও যেসব ব্যক্তিগণ নিয়মিতভাবে তাঁদের রচনার প্রকাশের দ্বারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন, সেই সব ব্যক্তি হলেন শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, যিনি প্রায়শ পৌষ উৎসবে অথবা মাঘোৎসবে আচার্যের আসন অলঙ্কৃত করেছেন এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করেছেন। এছাড়াও তাঁর ধর্মীয় অনুষঙ্গ রয়েছে। যেমন 'বেদান্তবাদ' রচনাটিতে লেখক বিধুশেখর শাস্ত্রী কখনও ভাস্করাচার্যের, কখনও বা বল্লভাচার্যের কিংবা কখনও শঙ্করাচার্যের মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

কিন্তু নেপালচন্দ্র রায় আবার ধর্মীয় অনুষঙ্গ থেকে সরে এসে 'সাময়িক প্রসঙ্গ' বিভাগে টাইটানিক জাহাজ ডুবি থেকে আরম্ভ করে রোম সাম্রাজ্যের কথা কখনও বা সিভিল ম্যারেজ আইন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অপর একজন লেখক হলেন শ্রীশরৎকুমার রায়। যিনি 'বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা' বিভাগে কখন ধর্মীয় অনুষঙ্গের আলোচনা, কখনও বা ধর্মীয় অনুষঙ্গ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে নিরপক্ষে দৃষ্টি নিয়ে লিখছেন 'ফলভোজনে জীবনধারণ'-এর কথা, কখনও বা 'বৌদ্ধসাধনা' প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশ করেছেন, 'বুদ্ধের আহ্বান' আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন বুদ্ধের বাণী। বুদ্ধ বলেছেন, ''তুমি বাক্যে ও মনে সংযত হও, শরীর দ্বারা কোন পাপ করিও না -- এই রূপ করিলে দেহে বাক্যে ও মনে পবিত্র হইয়া তুমি ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে পারিবে।''

এছাড়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'যন্ত্র ও জীব', 'বাহাইধর্ম', 'নিরামিষ আহার' নিয়ে আলোচনা করেছেন, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ইতিহাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'আশ্রমকথা' বিভাগে শ্রীসৌমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীসুধীররঞ্জন দাস, শ্রীউপেন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ, শ্রীকালিদাস বসু, বংশু, সুধাকান্ত, প্রদ্যোত, মুকুল, দীনু, প্রবোধ - এই সব লেখকেরা সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করে মূল্যবান লেখনী দ্বারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মান বাড়িয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় চারবছরের সময়পর্বে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্যান্য লেখকগণের যেসব রচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেইসব রচনার তালিকা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিমাসের সূচীপত্র থেকে বিস্তারিতভাবে তুলে দেওয়া হ'ল ঃ-

<u>বৈশাখ ১৮৩৩ শক (১৩১৮ বঙ্গাব্দ ১৯১০ সাল) ১লা বৈশাখ শুক্রবার, ৮১৩ সংখ্যা।</u>

				পৃষ্ঠা
নববর্ষ	-	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১
গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১
ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৬
সত্য, সুন্দর, মঙ্গল মঙ্গল	-	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১০
সাধু বাক্য	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১২
দাদূ	-	শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	-	১৪
সুফী ধর্ম্ম	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৭
যন্ত্র ও জীব	-	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	-	১৯
নববর্ষের প্রার্থনা	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২২
আশ্রম সংবাদ	-	শ্রীশরৎকুমার রায়	-	২২
গ্রন্থ সমালোচনা	-	-		

<u>জ্যৈষ্ঠ ৮১৪ সংখ্যা।</u>

বেদান্তবাদ	-	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	-	২৩
বিজয়ী	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	২৬
নববর্ষ	-	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৬
প্রেমের লক্ষণ কি, কি?	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	২৮
বর্ষশেষ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৯
স্বপ্নভঙ্গ	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	৩১
অন্তরের নববর্ষ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৩১
গীতাপাঠের ভূমিকা	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৩৪
সুফী ধর্ম্মমত	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৩৭
সত্য, সুন্দর, মঙ্গল মঙ্গল	-	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৩৯
দাদূ	-	শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	-	৪০
The Attitude of the Adi Brahma Samaj in Regard to the proposed amendment of act 1110/1872	-	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৪৪

আয় ব্যয়	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক।	-	৪৫

আষাঢ় ৮১৫ সংখ্যা।

বেদান্তবাদ	-	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	-	৪৭
সুন্দর	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৫০
সুফী কবি	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৫৩
গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৫৫
অন্ধের দৃষ্টিলাভ	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৬১
সমবায়-কৃষিসমিতি	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	৬২
ব্যর্থতা	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৬৩
নানা কথা	-	শ্রীঅতসী দেবী	-	৬৪
ক) জাতিস্বাতন্ত্র	-	ঐ		
খ) রণক্ষেত্রের কুকুর	-	ঐ		
গ) পাঞ্জাবের বিবাহপ্রথা	-	ঐ	-	৬৬
চরিতার্থ	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	৬৬

শ্রাবণ ৮১৬ সংখ্যা।

বেদান্তবাদ	-	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	-	৬৭
বর্ষা আবাহন	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৭২
বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৭২
গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৭৩
শীলশিক্ষা	-	শ্রীঅতসী দেবী	-	৭৬
সাধুবাক্য	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	৭৭
বাবীধর্ম্ম	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৭৯
কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	৮১
শরীরের শত্রু ও মিত্র	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৮৪
দাদূ	-	শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	-	৮৫
বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	৮৬
রক্তসঞ্চরণ	-	ঐ		
নক্ষত্রের সংঘাত	-	ঐ		
উদ্ভিদের সংজ্ঞানাশ	-	ঐ		
কল্পনা ও কল্পনাতীত	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	৮৮

ভাদ্র ৮১৭ সংখ্যা।

বেদান্তবাদ	-	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	-	৮৯
যিশুচরিত	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৯৪

ইউরোপে নব ধর্ম্মান্দোলন	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	৯৯
গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১০৫
সন্ধান	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১১১
পত্র	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১১১
বাবীধর্ম্ম	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১১৩
উপনিষৎ	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	১১৫
নানাকথা	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	১১৭
[উচ্চ হইতে পতন]				

<u>আশ্বিন ও কার্ত্তিক ৮১৮ ও ৮১৯ সংখ্যা।</u>

গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১১৯
ধর্ম্মের অর্থ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১২৭
পূজা	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	১৩৫
বেদান্তবাদ	-	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	-	১৩৫
কাব্যের অধিকারের প্রসরতা	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	১৪১
কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	১৪৫
বাবীধর্ম্ম	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৪৮
সুফী ধর্ম্মমত ও সাধনা	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	১৫১
টলষ্টয়ের শেষবাণী	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৫৩
কবি	-	শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	-	১৫৪
প্রজ্ঞা	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	১৫৫
বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা				
১। অঙ্কুরোৎপত্তির তত্ত্ব	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	১৫৬
২। কাঁচা মাংস চিকিৎসা	-	ঐ		
৩। লৌহের জমা খরচ	-	ঐ		
৪। উপবাসসম্বন্ধীয় দু'একটি কথা	-	ঐ	-	১৫৭
৫। দিগ্বলয়ের নিকটে চন্দ্রসূর্য্য বৃহদাকার দেখায় কেন?	-	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	-	১৫৮
৬। হাতীর দন্ত চিকিৎসা	-	শ্রীঅতসী দেবী	-	১৫৯
দাদূ	-	শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	-	১৫৯
নানা কথা				
১। আমেরিকার চীন জয়	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	১৬০
২। ফ্লরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্	-	শ্রীঅতসী দেবী	-	১৬১
৩। অজানা	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৬২

অগ্রহায়ণ ৮২০ সংখ্যা।

অনন্তপথে	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৬৩
গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৬৩
রোমীয় বহুদেববাদের পরিণতি	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৬৭
পরিণাম	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	১৬৯
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধনা	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	১৬৯
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৭৬
চিরসুখ	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	১৮৫
বাহাই ধর্ম্ম	-	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	-	১৮৫
সমদৃষ্টি	-	শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	-	১৮৮
বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা				
১। নিঃশব্দ গৃহ	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	১৮৯
২। পাকস্থলীর সহিষ্ণুতা	-	ঐ	-	১৮৯
৩। নিরামিষ আহার	-	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	-	১৮৯
নানাকথা	-	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	-	১৯০

পৌষ ৮২১ সংখ্যা।

বৌদ্ধধর্ম্মে ভক্তিবাদ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৯১
গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৯
কবীর (সমালোচনা)	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	২০১
কৃষি-উন্নতির দৃষ্টান্ত	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	২০৬
অহং ও স্বয়ং (কবিতা)	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	২০৯
বাহাই ধর্ম্ম	-	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	-	২১০
মহবুবী ধর্ম্ম	-	শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	-	২১২
ভারত সন্তান	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	২১৩
আশ্রম কথা	-	-	-	২১৪
বিফলতা	-	শ্রীসৌমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা	-	২১৫
জৈন সম্প্রদায় ও তাহাদের মন্দির	-	শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী	-	২১৬

মাঘ ৮২২ সংখ্যা।

ভারত-বিধাতা	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২১৯
গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২১৯
আবরণ	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	২২৪
ধর্ম্মশিক্ষা	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২২৭
লজ্জৎ-ই-জান্	-	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	-	২৩৮

সুফী আশ্রম	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	২৩৮
বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	২৪০
সাধনার ধন	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	২৪১
ব্রহ্মবিদ্যালয়				
আশ্রম-কথা	-	শ্রী	-	২৪১
বৌদ্ধ ভারতে ইৎ-সিং-এর				
ভ্রমণ বৃত্তান্ত	-	শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়	-	২৪২
জড়ের অস্তিত্ব	-	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	-	২৪৩
শনির কথা	-	শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ	-	২৪৪
পক্ষীর সমবেত চেষ্টা	-	শ্রী	-	২৪৫
লাজ	-	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার দত্ত	-	২৪৬

ফাল্গুন ৮২৩ সংখ্যা।

পিতার বোধ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৪৭
বৈচিত্র্যের সমস্যা	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	২৫৩
উৎসযাত্রী	-	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	-	২৫৯
আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৬৩
ব্রহ্মবিদ্যালয়				
আশ্রম-কথা	-	শ্রী	-	২৬৫
স্তব্ধ উপাসনার মন্দির	-	শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	-	২৬৬
মধ্যাহ্ন	-	শ্রীসুধীরঞ্জন দাস	-	২৬৭
ক্রোড় পত্র				
ধর্ম্মের নবযুগ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৬৮

চৈত্র ৮২৪ সংখ্যা।

নামকরণ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৭৩
সুফী-গুরু ও সুফী শিষ্য	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	২৭৫
আর্ট	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	২৭৮
নবজীবন	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	২৮৫
আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৮৫
রহস্যের সুর	-	শ্রীকালিদাস বসু	-	২৮৮
বেদান্তবাদ	-	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	-	২৮৯
ব্রহ্মবিদ্যালয়				
আশ্রম-কথা	-	শ্রী	-	২৯১
স্বর্গীয় সুহৃদকুমার সেনগুপ্ত	-	আশ্রম বালক	-	২৯২
অগ্নিকান্ড	-	আশ্রমবাসী	-	২৯৪
সংবাদ	-	জনৈক আশ্রমবাসী	-	২৯৪

বৈশাখ ১৮৩৪ শকাব্দ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ /১৯১২ সাল) ৮২৫ সংখ্যা।

বর্ষারম্ভে	-	শ্রীকালিদাস বসু	-	১
আত্মপরিচয়	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১
সত্য ও সমন্বয়	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	১১
প্রতীক্ষা	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৫
সুফীদের ভ্রমণ	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	১৫
পরাস্ত	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৭
ফলভোজনে জীবনধারণ	-	শ্রীশরৎকুমার রায়	-	১৭
কপোতের বার্ত্তাবহন	-	শ্রীজগদানন্দ রায়	-	১৮
সাময়িক প্রসঙ্গ	-	শ্রীনেপালচন্দ্র রায়	-	২০
ব্রহ্মবিদ্যালয়				
আশ্রম-কথা	-	শ্রী	-	২১
প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ				
গুটিপোকা ও প্রজাপতি	-	বংশু	-	২৩
অন্য এক শ্রেনীর প্রজাপতির	-			
জন্ম ইতিহাস	-	সুধাকান্ত	-	২৪
বোল্‌তা	-	প্রদ্যোত	-	২৫
প্রস্তুত হইবার শিক্ষা	-	লব	-	২৫
আশ্বাস	-	মুকুল	-	২৬
সন্ধ্যা	-	সুধাকান্ত	-	২৬

জ্যৈষ্ঠ - ৮২৬ সংখ্যা

ছুটি	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৭
রোগীর নববর্ষ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৭
মেটারলিঙ্কের 'দৃষ্টিহারা'	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	৩০
বেদান্তবাদ	-	শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য	-	৩৩
হিন্দু ব্রাহ্ম	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৩৬
বুদ্ধচরিত	-	শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	-	৪০
সাময়িক প্রসঙ্গ	-	শ্রীনেপালচন্দ্র রায়	-	৪২
স্বরলিপি	-	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	-	৪৫
ব্রহ্মবিদ্যালয়				
আশ্রম কথা	-	শ্রী অঃ	-	৪৭
বিষাক্ত গাছ ও জীব	-	শ্রীতরুণকুমার রায়		
প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ				
কাঠবিড়ালী	-	প্রদ্যোত	-	৫০
ব্যর্থদিন	-	দীনু	-	৫০

আষাঢ় ৮২৭ সংখ্যা।

শেষ কথা	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৫১
বিদ্যা এবং অবিদ্যা	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৫১
যাত্রার পূর্ব্বপত্র	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৫২
সৌন্দর্য ও মহিমা	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	৬১
বোম্বাই সহর	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৬৫
কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	৬৬
আকাশের রং নীল কেন?	-	শ্রীসুজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	৬৮
স্বরলিপি	-	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	-	৬৯
গান	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৬৯
ব্রহ্মবিদ্যালয়				
আশ্রম কথা	-	শ্রীঃ-	-	৭২
প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ				
গুটিপোকা ও প্রজাপতি	-	সুধাকন্ত	-	৭৩
মাকড়সা	-	প্রবোধ	-	৭৪
পরিণতি	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	৭৬

শ্রাবণ ৮২৮ সংখ্যা।

আনন্দরূপ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৭৭
আঁধারের ধন	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৭৮
যাত্রা	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৭৮
গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৮১
সমুদ্রপাড়ি	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৯১
মহাধ্যান	-	শ্রীকালিদাস বসু	-	৯৫
বিষাক্ত গাছ	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৯৫
দীপাঞ্জলি	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	৯৭
বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা				
[ইক্ষুদন্ড হইতে মোম প্রস্তুত	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	৯৭
মরুভূমিতে উদ্ভিদের জলদান	-	ঐ	-	৯৭
চোরাবালি	-	ঐ	-	৯৭
স্বরলিপি	-	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	-	৯৮
গান	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৯৮
ব্রহ্মবিদ্যালয়				
আশ্রম কথা	-	শ্রী ঃ-	-	১০১
প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ				
কাঠ্‌ঠোক্‌রা	-	বংশু	-	১০১
আকন্দগাছের গুটিপোকা				
ও প্রজাপতি	-	সুধাকান্ত	-	১০২

ভাদ্র ৮২৯ সংখ্যা।

আলোছায়া	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১০৩
খেলা ও কাজ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১০৩
বেদান্তবাদ	-	শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য	-	১০৬
বারতা	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১০৯
কর্ম্মসৃষ্টি	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	১১০
অর্ঘ্য	-	শ্রীকালিদাস বসু	-	১১২
আজীবক	-	শ্রীশরৎকুমার রায়	-	১১৩
বর্ষানান্দী	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১১৫
সত্যবোধ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১১৬
গীতা-পাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১১৮
ধর্ম্মসঙ্গীতের যথার্থ স্বরূপ	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	১২০
ভক্তবানী	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১২৪
কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	১২৫
ব্রহ্মবিদ্যালয়				
প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ				
মধুমালতীর প্রজাপতি	-	সুধাকান্ত	-	১২৭
তসরের গুটিপোকার প্রজাপতি	-	সুধাকান্ত	-	১২৮

আশ্বিন ৮৩০ সংখ্যা

পূজা	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১২৯
সমাজ ভেদ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১২৯
ভক্তবাণী	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১৩২
সীমার সার্থকতা	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৩৪
পরাভব	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৩৬
স্বরলিপি	-	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	-	১৩৭
বেদান্তবাদ	-	শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য	-	১৩৮
গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৪১
শুচি	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৪৫
নিরানন্দ	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	১৪৬
কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	১৪৭
বৌদ্ধ সাধনা	-	শ্রীশরৎকুমার রায়	-	১৪৯
দুঃসাহসী	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১৫২
ব্রহ্মবিদ্যালয়				
স্বাধীনতা	-	শ্রী ঃ-	-	১৫৩
প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ				

মেঠো শুঁয়াপোকা ও তাহার প্রজাপতি	-	সুধাকান্ত	-	১৫৪

কার্ত্তিক ৮৩১ সংখ্যা।

বর্ত্তমান	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১৫৫
ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৫৫
কবিতা	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	১৫৮
ভক্তবাণী	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১৬৫
বৌদ্ধ সাধনা	-	শ্রীশরৎকুমার রায়	-	১৬৭
আবির্ভাব	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১৭০
সীমা ও অসীমতা	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৭০
আলোচনা	-	শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ	-	১৭২
জানা কথা	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	১৭৩
নানা কথা	-	শ্রীনেপালচন্দ্র রায়	-	১৭৪
কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	১৭৫
ব্রহ্মবিদ্যালয় চিঠি	-	শ্রীকালীমোহন ঘোষ শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মন শ্রীচণ্ডীচরণ সিংহ শ্রীনারায়ণ কাশীনাথ দেবল	-	১৭৭
ব্রহ্মবিদ্যালয় চিঠি	-	আশ্রমবাসী	-	১৭৭
আশ্রম-সংবাদ	-	ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সংকলিত	-	১৭৯

অগ্রহায়ণ ৮৩২ সংখ্যা

লক্ষ্য ও শিক্ষা	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৮১
ভক্তবাণী	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১৮৪
গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৮৬
মহাশ্বেতা	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১৯০
মহাশ্বেতার প্রতীক্ষা	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১৯০
বুদ্ধের আহ্বান	-	শ্রীশরৎকুমার রায়	-	১৯০
বিশেষত্ব ও বিশ্ব	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৯২
দেহশত্রু ও দেহবন্ধু	-	শ্রীজগদানন্দ রায়	-	১৯৪
খিল্‌বৎ	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	১৯৬
আশ্বিনের বঙ্গদর্শনের চরিত চিত্র	-	শ্রীপাঠক	-	১৯৯
শোক সংবাদ	-	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	-	২০১

ছুঁচোর কথা	-	শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	-	২০২
তত্ত্ববোধিনী সভা	-	সম্পাদক - শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক -শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ধনাধ্যক্ষ -শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	-	২০৪

পৌষ ৮৩৩ সংখ্যা।

সত্য হওয়া	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২০৭
মুসলমান হিন্দু ও খৃষ্টান	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	২০৯
আমেরিকার ঘরের কথা	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	২১৫
প্রার্থিত	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	২১৮
ভক্তবাণী	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	২১৮
ইংলন্ডের পল্লীগ্রাম ও প্রাদ্রী (বিলাতের পত্র)	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২২০
অকৃতজ্ঞ	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	২২৪
আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে কবি য়েট্‌সের অভিমত	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	২২৪
অভিজ্ঞতা	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	২২৬
গান	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২২৭
স্বরলিপি	-	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	-	২২৭
ব্রহ্মবিদ্যালয় বিজ্ঞাপন	-	শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার	-	২২৯
আশ্রম কথা	-	-	-	২২৯
প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ শালগাছের শুঁয়োপোকা ও তাহার প্রজাপতি	-	শ্রীসুধাকান্ত রায়	-	২৩০

মাঘ ৮৩৪ সংখ্যা।

সত্যকে দেখা	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৩১
সাহিত্যে শৈশবের স্থান	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	২৩২
মহর্ষি জীবনের কয়েকটি বিশেষত্ব	-	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	-	২৩৬
ভক্তবাণী	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	২৩৮
আকাশের চাঁদ	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	২৪০
বেদান্তবাদ	-	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	-	২৪০
অপার্থিব	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	২৪২
শান্তিনিকেতনের দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব	-		-	২৪৩
ব্রহ্মবিদ্যালয় আশ্রম কথা	-	-	-	২৪৩

বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী	-	সহঃ সম্পাদক	-	২৪৪

ফাল্গুন ৮৩৫ সংখ্যা।

আমেরিকার চিঠি	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৫১
ধর্ম্ম ও স্বাজাত্য	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	২৫২
গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৬৪
এ্যশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।		-		
সহজসত্য	-	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৬৯
উদ্বোধন	-	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৭২
সত্য জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম	-	শ্রীক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৭৩
সংবাদ	-	-	-	২৭৫

চৈত্র ৮৩৬ সংখ্যা।

বেদান্তবাদ	-	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	-	২৭৭
গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৭৯
অধ্যাপক অয়কেনের একটি লেখা	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	২৮২
অটল	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	২৮৬
আমেরিকায় নিগ্রোহত্যা ও আমেরিকানের প্রায়শ্চিত্ত	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	২৮৬
উৎসর্গ	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	২৮৮
ব্যক্তিত্ব-বোধ	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	২৮৮
উপদেশ	-	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৯১
আশ্রমবন্ধু সি, এফ, এন্ড্রুজ	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	২৯৩
ব্রহ্মবিদ্যালয়				
প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ	-	শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী	-	২৯৭

বৈশাখ - ১৮৩৫ শক (১৩২০ সাল/১৯১৩ খ্রীস্টাব্দ) ১লা বৈশাখ সোমবার। ৮৩৭ সংখ্যা।

যাচাই	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১
গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২
তীর্থযাত্রা	-	শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	-	৬
বৌদ্ধ জীবন	-	শ্রীশরৎকুমার রায়	-	৯
গণতন্ত্রতায় সংযমের স্থান	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	১১
সুখ - মৃত্যু	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১৬
আমেরিকার চিঠির কয়েকটি অংশ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৯
কর্ম্মসাধনা (কবিতা)	-	শ্রীহেমলতা দেবী	-	২১

অভিন্ন (কবিতা)	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	- ২১
বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা	-	শ্রীজগদানন্দ রায়	- ২২
বিশ্বসংবাদ	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	- ২৪
আদিব্রাহ্মসমাজ (কার্য্যবিবরণী)	-		- ২৬-২৭
আয়-ব্যয়	-	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক।	- ২৮
বিজ্ঞাপন	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	- ২৮

<u>জ্যৈষ্ঠ ৮৩৮ সংখ্যা।</u>

বেদগান	-	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	- ২৯
অখন্ড জীবন	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	- ৩০
কান্টের শিক্ষানীতি ও আশ্রমের শিক্ষার আদর্শ	-	শ্রীকালীমোহন ঘোষ	- ৩৪
গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	- ৩৫
বিশ্বকর্ম্মা	-	শ্রীহেমলতা দেবী	- ৩৮
জাতি - সংঘাত	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	- ৩৯
ভক্তবাণী	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	- ৪৩
যোগীবেশ	-	শ্রীহেমলতা দেবী	- ৪৪
বিলাতের চিঠি	-	শ্রীনারায়ণ কাশীনাথ দেবল	- ৪৪
শেষযাত্রা	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	- ৪৬
আবেলার্ড ও মধ্যযুগের ইউরোপ	-	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	- ৪৬
দৈবলীলা	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	- ৫১
পরলোকগত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	- ৫১
বিশ্বসংবাদ	-	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	- ৫৪
আয় ব্যয়	-	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক।	- ৫৬

<u>আষাঢ় ৮৩৯ সংখ্যা।</u>

উদ্বোধন	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	- ৫৭
বিলাতের পত্র	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	- ৫৭
ভক্তবাণী (Pasims of David)	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	- ৫৮
প্রাচীন ভারতবর্ষে অন্ত্যজ জাতি	-	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	- ৬০
গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	- ৬২

মিষ্টিসিজ্‌ম্‌ নামক গ্রন্থ পাঠান্তে	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	৬৮
একটি উপাখ্যান	-	শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার	-	৭২
সাধু বার্ণাড	-	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	-	৭৫
বিশ্বসংবাদ				
(আয়র্লন্ড ও ভারতবর্ষ)	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	৭৮
আয় ব্যয়	-	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
		শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	৮০
		সম্পাদক		
বিজ্ঞাপন	-	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	-	৮০

শ্রাবণ ৮৪০ সংখ্যা।

অনুশোচনা	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	৮১
ভক্তবাণী	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	৮১
গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৮৩
মেটারলিঙ্ক	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	৮৮
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দন্ডবিধি	-	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	-	৯৮
মানব হৃদয়	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১০২
চেতনা	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১০২
বৌদ্ধ সাধকের আদর্শ	-	শ্রীশরৎকুমার রায়	-	১০৩
আমেরিকান বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা	-	শ্রী	-	১০৫

ভাদ্র ৮৪১ সংখ্যা।

মনোরথ	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১০৭
সন্ধ্যায়	-	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১০৭
গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১০৮
জলালুদ্দিন রূমি	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১১৩
সম্বল	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১১৬
ইতর প্রাণীর চৈতন্য	-	শ্রীসুজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	১১৭
বৌদ্ধ সাধকের নির্ব্বাণ	-	শ্রীশরৎকুমার রায়	-	১২০
পরলোকগত আচার্য্য				
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	১২২
মন্তেসরি শিক্ষা প্রণালী	-	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	-	১২৪
আয় ব্যয়	-	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
		শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	১২৮
		সম্পাদক।		

আশ্বিন ৮৪২ সংখ্যা।

বেদান্তবাদ	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	-	১২৯
জৈনসম্প্রদায় ও বল্লভাচার্য্য	শ্রীসতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৩২
মঞ্জরী	শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী	-	১৩৬
শিল্পী হিসাবে মরমী কবির স্থান	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৩৭
বিলাতের চিঠি	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৩৯
ভারতবর্ষের জাতিসংঘাত সমস্যা	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	-	১৪০
জালালুদ্দিন রূমির কবিতা	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৪৩
গীতাপাঠ	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৪৫
বিশ্বসংবাদ	শ্রী	-	১৪৯
আশ্রমকথা	শ্রী	-	১৫১
আয় ব্যয়	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক।	-	১৫২

কার্ত্তিক ৮৪৩ সংখ্যা।

স্বামী-নারায়ণ	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৫৩
চীনদেশীয় টাও ধর্ম্ম	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৫৪
অপরাধের কারণ ও নিরাকরণ	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	-	১৫৭
আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় আধ্যাত্মিকতার অভাব	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৫৯
ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্য	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৬১
আয় ব্যয়	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক।	-	১৬২
পরিশিষ্ট	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি।	-	১৬৩

অগ্রহায়ণ ও পৌষ ৮৪৪ ও ৮৪৫ সংখ্যা।

শিখ ধর্ম্ম	শ্রী	-	১৬৫
এডমন্ড হোল্‌মসের কবিতা	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	১৭০
জলালুদ্দিন রূমির কবিতা	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৭৪
বাবা নানকের সাধনা	শ্রীশরৎ কুমার রায়	-	১৭৫
জড়থুস্ত্রের ধর্ম্ম	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৭৭
বুদ্ধের সার্ব্বভৌমিকতা	শ্রীশরৎ কুমার রায়	-	১৮২
নূতন গান ও স্বরলিপি	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৮৫
কথা ও সুর	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৮৫

র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের বক্তৃতা -	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	১৮৬
বিস্ময় -	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৯০
বীর কেশ -	ঐ	-	১৯০
আশ্রমকথা -	শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়	-	১৯০
আয় ব্যয় -	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক।	-	১৯১
ছাত্র-সভা			
গ্রামের বিদ্যালয়			
কৃষিকার্য্য -	মিঃ এন্ড্রুজ ও পিয়ার্সন	-	১৯১

মাঘ ৮৪৬ সংখ্যা।

পৃথিবীর শৈশব -	শ্রীজগদানন্দ রায়	-	১৯৩
একটি প্রশ্ন -	শ্রীস	-	১৯৭
মেটারলিঙ্কের বাণী -	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৯৮
নূতন গান ও স্বরলিপি -	ঐ	-	২০২
কথা ও সুর -	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২০২
৭ই পৌষের উপদেশ (১) -	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	২০৪
৭ই পৌষের উপদেশ (২)			
সায়ংকালের উপদেশ -	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও		
	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	২০৬
উদ্বোধন -	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২০৭
অগ্রসর হওয়ার আহ্বান -	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও		
	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	২০৮
সার্থক আমি -	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২১১
শান্তিনিকেতন আশ্রম-			
বিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণী -	শ্রী	-	২১১
গান ও স্বরলিপি -	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২১৫
আশ্রমকথা -	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	২১৭
আয় ব্যয় -	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর		
	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক।	-	২১৮

ফাল্গুন ৮৪৭ সংখ্যা।

চতুরশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব -	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২১৯

সঙ্গীত	-	শ্রী	-	২২৩
ছোট ও বড়	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২২৫
উদ্বোধন	-	শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	-	২৩২
সঙ্গীত	-	শ্রী	-	২৩৬
আয় ব্যয়	-	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক।	-	২৩৯

চৈত্র ৮৪৮ সংখ্যা।

গীতাপাঠ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৪১
একটি মন্ত্র	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৫১
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ব্রহ্মবিদ্যালয়	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৫৭
জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথমকথা	-	শ্রীজগদানন্দ রায়	-	২৫৯
আশ্রম সংবাদ	-	শ্রীআশ্রমবাসী	-	২৬৩
আয় ব্যয়	-	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক।	-	২৬৪

বৈশাখ ১৮৩৬ শক (১৩২১ সাল/১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ) ৮৪৯ সংখ্যা।

নূতন গান	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১
জন্ম	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	৪
মনুষ্যত্বের সাধনা	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৭
আমার বোম্বাই প্রবাস	-	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১০
রামানন্দ ব্রহ্ম বিদ্যালয়	-	শ্রীশরৎ কুমার রায়	-	১৪
ইউরোপের ইতিহাসের ধারা প্রথম প্রস্তাব	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	১৫
গন্ধরাজ গাছের কীট ও তাহার প্রজাপতি	-	শ্রীসুধাংশু রায় চৌধুরী	-	২৩

জ্যৈষ্ঠ ৮৫০ সংখ্যা।

বর্ষশেষ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৫
নববর্ষ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	২৭
কবীর	-	শ্রীশরৎকুমার রায়	-	২৯

বীরভূমের কথা	-	শ্রীকালীমোহন ঘোষ	-	৩৪
নূতন গান	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৩৮
নূতন গানের স্বরলিপি	-	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	-	৩৮
ব্রাহ্মসমাজের সমস্যা	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	৪০
ব্রহ্মবিদ্যালয়				
আশ্রম সংবাদ	-	শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়	-	৪২
সংবাদ	-	-	-	৪৩
আয় ব্যয়	-	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	৪৪

সম্পাদক।

আষাঢ় ৮৫১ সংখ্যা।

ব্রাহ্ম ও হিন্দু	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	৪৫
সার্দ্ধ তিন সহস্র কলেজের				
যুবকের অধ্যাপনা ব্রত	-	শ্রীশরৎকুমার রায়	-	৫০
নিউইয়র্কের একটি আশ্রম	-	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	৫৫
পত্র	-	শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল	-	৫৭
ইউরোপের ইতিহাসের ধারা	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	৫৯
সৌভাগ্য	-	শ্রীসুরমাসুন্দরী বসু	-	৬৮
ব্রহ্মবিদ্যালয়	-	-		

শ্রাবণ ৮৫২ সংখ্যা।

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক প্রসঙ্গ	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	৬৯
প্রেমই ধর্ম্ম	-	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	-	৭৩
পানামা খাল	-	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	-	৭৬
পত্রোত্তর	-	শ্রীকালীমোহন ঘোষ	-	৭৯
'ব্রাহ্ম ও হিন্দু' প্রবন্ধ সম্বন্ধে				
পত্র	-	শ্রী	-	৮১
পত্রোত্তর	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	৮২
ব্রহ্মবিদ্যালয়				
আশ্রম কথা	-	শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়	-	৮৫
আয় ব্যয়	-	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	-	৮৬

সম্পাদক।

ভাদ্র ৮৫৩ সংখ্যা।

নূতন গান ও স্বরলিপি	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	৮৭
বুদ্ধ ও বৌদ্ধ শাস্ত্র	শ্রীশরৎকুমার রায়	-	৯০
বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ ও আবিষ্কার	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	-	৯৩
বিস্মৃত ইতিহাসের একপৃষ্ঠা	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	-	৯৫
'ব্রাহ্ম ও হিন্দু' প্রবন্ধের প্রতিবাদ	শ্রীসুকুমার রায়চৌধুরী	-	৯৭
প্রতিবাদের উত্তর	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	৯৯
ব্রহ্মবিদ্যালয়			
আশ্রম কথা	শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়	-	১০২
আয় ব্যয়	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক।	-	১০৪

আশ্বিন ও কার্ত্তিক ৮৫৪/৫৫ সংখ্যা।

মা মা হিংসীঃ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১০৫
'ধর্ম্মসমন্বয়' সম্বন্ধে পত্র	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	১০৭
লোকশিক্ষা ও শিক্ষিত সমাজ	শ্রীকালীমোহন ঘোষ	-	১১০
পাপের মার্জ্জনা	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১১৭
ব্রাহ্মহিন্দু সমস্যা (প্রতিবাদ)	শ্রীসুকুমার রায়চৌধুরী	-	১১৮
ব্রাহ্মহিন্দু সমস্যা (প্রতিবাদের উত্তর)	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	১২২
বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি চিন্তা	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	-	১২৬
আশ্রমকথা	শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়		১২৮
আয় ব্যয়	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক।	-	১২৯

অগ্রহায়ণ ৮৫৬ সংখ্যা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতি	শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	-	১৩১
সাধনা ও সিদ্ধি	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	১৩৪
মন্দিরের উপদেশ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৩৭
নূতন গান ও স্বরলিপি	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১৩৯
মুক্তি	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	-	১৪২
প্রতিবাদ পত্র	শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ	-	১৪৩
প্রতিবাদ সম্বন্ধে বক্তব্য	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	-	১৪৯

পৌষ ৮৫৭ সংখ্যা।

বৌদ্ধসংঘ ও জনসাধারণ	-	শ্রীশরৎকুমার রায়	১৫১
সগুন ও নির্গুন ব্রহ্মবাদ	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	১৫৪
নূতন গান ও স্বরলিপ	-	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫৭
ব্রাহ্মহিন্দু সমস্যা	-	শ্রীসুকুমার রায়চৌধুরী	১৫৯
ব্রাহ্মহিন্দু সমস্যা	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	১৬১
আশ্রম-কথা	-	শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়	১৬৫

মাঘ ৮৫৮ সংখ্যা।

শান্তিনিকেতনে ৭-ই পৌষ			
প্রাতঃকালের উদ্বোধন	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬৭
৭ই পৌষের উপদেশ	-	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭১
৭ই পৌষ ও আশ্রম	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	১৭২
শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণী	-		১৭৮
সংবাদ	-	শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	১৮২

ফাল্গুন ৮৫৯ সংখ্যা।

পঞ্চশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৩
সঙ্গীত	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৭
১১ই মাঘের সায়ংকালের উদ্বোধন	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৯
সঙ্গীত	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯৩
বৌদ্ধ-বিধি সঙ্ঘের প্রকৃতি	-	শ্রীশরৎ কুমার রায়	১৯৫
আয় ব্যয়	-	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক।	১৯৮

চৈত্র ৮৬০ সংখ্যা ।

আশ্রমে শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী	-	শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী	১৯৯
কর্ম্মযজ্ঞ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০১
লোকহিতের নূতন আদর্শ	-	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী	২০৪
আত্মসম্পদ	-	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২১৩
বসন্ত মধ্যাহ্ন	-	শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী	২১৪

উল্লেখ পঞ্জি ঃ

১। 'ভান্ডার' পত্রিকা, ১ম ভাগ বৈশাখ ১৩১২, পৃ-১।

২। 'ভারতী' পত্রিকা, ১৩০৫ চৈত্র, পৃ-১১২৩।

৩। 'ভারতীর ভিটা' শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী, পৃ-৩৭৩।

৪। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ-৯২।

৫। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, নীহারঞ্জন রায়, পৃ-১।

৬। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ-৪৯।

৭। তদেব, পৃ-৫১।

৮। ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮৩৩ শকাব্দ, পৃ-৭।

৯। তদেব, পৃ-৮।

১০। তদেব, পৃ-১০।

১১। 'ধর্ম্মের অর্থ', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৮৩৩ শকাব্দ, পৃ-১২৭।

১২। তদেব, পৃ-১২৯।

১৩। 'ধর্ম্মের নবযুগ', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৮৩৩ শকাব্দ, পৃ-২৬৮।

১৪। তদেব, পৃ-২৬৯।

১৫। তদেব, পৃ-২৭০।

১৬। 'ধর্ম্ম শিক্ষা', তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৮৩৩ শকাব্দ, পৃ-২২৮।

১৭। তদেব, পৃ-২২৭।

১৮। রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খন্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ-৩৬৪।

১৯। 'আত্মপরিচয়' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮৩৪ শকাব্দ, পৃ-১০।

২০। তদেব, পৃ-৫।